স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

৩য় বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল - মে ২০১৫

সম্পাদক

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে, গোপাল সরকার

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

চতুর্থ প্রচ্ছদ ❑ ঈলীনা বণিক

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক

ডা. জয়ন্ত কুমার দাস

স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে

ফ্ল্যাট: এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড

হাওড়া-৭১১১০৩

মুখ্য পরিবেশক

বিশাল বুক সেন্টার

৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬

ফোন: ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক

এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় - চিকিৎসক, ওষুধ কোম্পানি ও সরকার ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ: **ভারতের এক নতুন ওষুধ আইন করা উচিত—*ল্যান্সেট*** ৫

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে সুপ্রাচীন ও অতীব মান্য জার্নাল *ল্যান্সেট* ভারতের ওষুধ আইন নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। ভারত সরকারের ওষুধ নীতি বিশ্লেষণ করে ভারতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য স্বার্থ রক্ষায় *ল্যান্সেট* সুনির্দিষ্ট কিছু পরামর্শ রেখেছে। প্রবন্ধটি লিখেছেন— **পিটার রডরিক, রুশিকেষ মহাজন, প্যাট্রিসিয়া ম্যাকগেট্টিগান ও অ্যালিসন এম পোলক**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ: **ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্রে ওষুধ—একটি নৈতিক সমস্যা** ১১

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জেনেরিক নামে ওষুধ লেখা আর নীতিসঙ্গত ওষুধের ব্যবহার করা উচিত। সরকারকে এ ব্যাপারে সতর্ক ও কড়া হতে হবে। ওষুধ কোম্পানিগুলোর অতি মুনাফা কমাতে হবে, নইলে চিকিৎসা করতে গিয়ে গরিব মানুষ ফতুর হবেন— বলেছেন **ডা. কে. কে প্রিয়াঙ্কা**।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ: **বধিরতা** ১৪

কানে শোনার সমস্যা বা বধিরতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ করা যায়, অন্য অনেক ক্ষেত্রে আংশিক বা পূর্ণ প্রতিকার সম্ভব। কিন্তু তার জন্য আপনাকেই সচেতন হতে হবে—লিখছেন **ডা. অসীমজীবন বসু**।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ: **কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করবেন কেন ও কীভাবে?** ১৭

জিভে জল আনা খাবার খেতে গেলেই ডাক্তারদের রক্তচক্ষু— ''কোলেস্টেরল বেড়ে যাবে''। কোলেস্টেরল কী? বাড়লে ক্ষতিই বা কী? বেড়ে যাওয়া আটকাতে কী করবেন? কী খাবেন আর কী খাবেন না? উত্তর দিচ্ছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**।

অচেনা আঞ্জনি ২৩

চোখের পাতায় একেবারে ধার ঘেঁসে লাল হয়ে ফুলে ফোঁড়ার মতো হয়ে উঠল, চোখে জ্বালা আর জল পড়া: ভারী কষ্টের রোগ। কিন্তু সত্যিই কি বিপজ্জনক হতে পারে এই 'আঞ্জনি'? চিকিৎসা করবেন কেমন করে? — লিখছেন **ডা. চন্দন বারি**।

নবজাতকের খাদ্য খাবার (পর্ব ৮)-৬ মাস বয়সের পর শিশুর খাবার ২৪

মা তাঁর শিশুকে স্তনদান করতে যদি না পারেন? যদি আটকা পড়েন কাজে বা অন্য কোনো অসুবিধায়? কী খাবে সেই শিশু? কেমন করেই বা পুরো পুষ্টি পাবে? উত্তর দিচ্ছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস**

মাল্টিভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং আরও পাঁচরকম ৩২

''ডাক্তারবাবু, শরীরটা বড্ড দুব্বল, একটা ভিটামিন লিখে দেন তো''—কথাগুলো সবার খুব পরিচিত ঠেকবে। ভিটামিন টনিক ইত্যাদি নিয়ে অপবিজ্ঞান সর্বব্যাপী, আর নিজের লাভের তাগিদে তাতে ইন্ধন জোগায় ওষুধ কোম্পানিগুলো—লিখছেন **ডা. অর্ক বৈরাগ্য**।

চোখের পাতায় হলুদাভ দাগ বা পীত অক্ষি পল্লব ৩৬

চোখের পাতায় হলুদাভ দাগ মানে কি রক্তে কোলেস্টেরল বেড়েছে— লিখছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

সন্দেহবাতিক রোগ: উপসর্গ ও চিকিৎসা ৩৭
সন্দেহবাতিক রোগটি কী, কেমন করে রোগটিকে চিনবেন, আর কীই-বা তার চিকিৎসা—বলছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য**।

হিংস্রতা ৩৯
ভায়োলেন্স তথা হিংসা কি মানুষের অন্তর্লীন প্রবৃত্তি? নাকি সমাজই মানুষকে বাধ্য করে হিংসার পথ নিতে? ভালো হিংসা আর খারাপ হিংসা বলে কিছু কি আছে? তাদের তফাৎ করার বৈজ্ঞানিক রাস্তা আছে কি কিছু? আলোচনা করছেন **ডা. সুমিত দাশ**।

চেনা ওষুধ অজানা কথা ৪৩
'অম্বলের ওষুধ' র‍্যানিটিডিন নিয়ে A Lay Person's Guide to Medicines, LOCOST, Vadodara, 2006 থেকে সংকলন।

সদ্যোজাত শিশুদের জন্ডিস ৪৫
জন্মাতে-না-জন্মাতেই জন্ডিস! জন্ডিস বা ন্যাবা বা পাণ্ডুরোগকে এমনিতেই ভয় পাই আমরা, তার ওপর ওই কচি বাচ্চার এমন ভয়ানক রোগ কী নিদারুণ ক্ষতিই না করবে! ব্যাপারটা কিন্তু তত ভয়ের নয়, যদিও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সাবধান না হলে বিপদ আছে—লিখছেন **ডা. অলোক হালদার**।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক ৪৮
আমাদের দেশে বাস্তব হল, স্বশিক্ষিত মেডিক্যাল ডিগ্রিবিহীন 'চিকিৎসক'-রাই গ্রামেগঞ্জে গরিব মানুষের একমাত্র ভরসা। সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে এঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে লাভ নেই, বরং দরকার এঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করা—লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে ৫১

বাবা কী? ৫২
ছোট্ট মেয়ে অমরাবতী জিজ্ঞেস করে তার মা-কে বাবা কী? কী উত্তর দিলেন মা? কলকাতার প্রথম আইভিএফ একক মায়ের টানাপোড়েনের অভিজ্ঞতা। লিখছেন— **ঈলীনা বণিক**।

মেনোপজ ৫৮
মেয়েদের ঋতুচক্র একটি বয়সের পর স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে তার সঙ্গে কিছু সমস্যা হতেও পারে। সমস্যাগুলি কীরকম, আর তার মোকাবিলাই বা কীভাবে করবেন, জানাচ্ছেন ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন নিয়ে দু-চার কথা ৬০
'সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য' পেতে গেলে সকলের, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের, সরকারি ব্যবস্থায় সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে---লিখছেন **ডা. অভিজিৎ পাল**।

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: ❑ পাতিরাম, ❑ বুকমার্ক, ❑ পিপলস বুক সোসাইটি, ❑ বই-চিত্র, ❑ মনীষা গ্রন্থালয়, ❑ নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, ❑ অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), ❑ এস কে বুকস (উল্টোডাঙা), ❑ শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ❑ লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭, ❑ কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়), ❑ দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, ❑ ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ), ❑ বইকল্প (ঢাকুরিয়া), ❑ পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১), ❑ জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮), ❑ প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯), ❑ মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪), ❑ প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২), ❑ সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৮৯২৬২৮৬২৬৪), ❑ শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশানের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাবার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-এর গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সম্পাদকীয়

চিকিৎসক, ওষুধ কোম্পানি ও সরকার

২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে ম্যাঙ্গালোরে প্রথম সর্বভারতীয় গণ মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল। সেখানে পাশ করে যাবার পরে চিকিৎসকদের শিক্ষা চালিয়ে যাবার সমস্যা একটা বড়ো সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে। পাশ করার পর ক-জন ডাক্তার আর মেডিক্যাল কলেজে যুক্ত থাকেন? যারা থাকেন না, তাঁরা রোগী দেখেন, চিকিৎসা করেন, কিন্তু নতুন বিদ্যা নতুন কৃৎকৌশল শেখার সুযোগ পান না, অনেক পুরোনো শিক্ষাও ভুলে যান, আর এটাই স্বাভাবিক। 'উন্নত' দেশগুলোতে পাশ করার পর চিকিৎসা চালিয়ে যাবার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, রয়েছে নানারকমভাবে পরীক্ষা নেওয়া; সেগুলো চিকিৎসকের পুরোনো জ্ঞান ঝালাই করে, আর নতুন জ্ঞান অর্জন করায়। তাতে লাভ রোগীদের, এবং ডাক্তারদেরও বটে।

আমাদের দেশে এমন কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সেই শূন্যস্থান এদেশে পূরণ করছেন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা। কখনো তাঁরা নিজেদের রঙিন ফোল্ডার খুলে ডাক্তারদের 'পড়াচ্ছেন' কখনো বা তাঁদের দেওয়া ভোজসভায় কোম্পানির ডাক্তার 'এক্সপার্ট'-রা এসে বক্তৃতা দিচ্ছেন, কখনো তাঁরা ডাক্তারদের নিজস্ব পেশাগত মিটিঙে বক্তাদের 'স্পনসর' করছেন। কোম্পানিগুলো একাজ করছে কেন? তারা তো আর দানছত্র খুলে বসেনি। করছে, কেননা এইভাবে তাদের বিজ্ঞাপন হয়, বিক্রি বাড়ে। ডাক্তাররা কোম্পানির কথায় প্রভাবিত হয়ে তাদের ব্র্যান্ডনামে ওষুধ লিখছেন। এদেশে জেনেরিক নামে ওষুধ লিখলেও রোগী তা পায় না। কিন্তু দামি ব্র্যান্ড লেখার ফলে রোগীদের খরচা বহুগুণে বাড়ছে।

ব্র্যান্ডনামে ওষুধ লেখার পাশে রয়েছে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন (ওষুধ-মিশ্রণ), যাদের প্রায় প্রত্যেকটিই অবৈজ্ঞানিক এবং দামি, রয়েছে আরও হাজার রকম অযৌক্তিক ওষুধ, টনিক, ভিটামিন, যেগুলো ডাক্তারি বইতে নেই, আছে কেবল আমাদের দেশে ওষুধের দোকানের তাকে। দোকানি সবসময় ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের তোয়াক্কা করে না, রোগীকে নিজেই উপদেশসহ ওষুধ বেচে দেয়। ডাক্তাররা লিখছেন হয় ভুল বুঝে, অথবা রোগীর স্বার্থের চাইতে ওষুধ কোম্পানির স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে, সেটা নিয়ে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র এবারের সংখ্যায় আলোচনা করেছেন ডা. কে কে প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু সরকার মানুষের স্বার্থবিরোধী এমন ওষুধের বিক্রি বাড়ছে দেখেও কি কিছু করছেন? আশঙ্কা হয়, সরকারও সেরকম কিছু করছেন না, বরং বড়ো ওষুধ কোম্পানির স্বার্থ দেখছেন। এটা কিন্তু আমাদের কথা নয়, বলছে শতাব্দীরও বেশি প্রাচীন এবং সর্বমান্য জার্নাল *ল্যান্সেট (Lancet)*। এবারের *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাতায় রইল *ল্যান্সেট*-এর দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে ভারত সরকারের ওষুধ নীতির পর্যালোচনা। সুধী পাঠক, ওষুধ নিয়ে অনৈতিক কাজ-কারবার সম্পর্কে নিজে অবহিত হোন; আশপাশের মানুষজনকে জানান।

❑ এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখাই সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান বিশেষত চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.
P-77, KALINDI HOUSING ESTATE
KOLKATA - 700089

ভারতের এক নতুন ওষুধ আইন করা উচিত—*ল্যান্সেট*

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে *ল্যান্সেট (Lancet)* একটা সুপ্রাচীন ও অতীব মান্য জার্নাল। সেই জার্নাল গত বছর (*ল্যান্সেট*, ভলুম ৩৮৩, নং ৯৯১৩ পৃষ্ঠা ২০৩-২০৬, জানুয়ারি ২০১৪) ভারতের ওষুধ আইন নিয়ে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ভারতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও স্বার্থ রক্ষায় ভারত সরকার যথাযথ উদ্যোগী নন, আমাদের এই সন্দেহ *ল্যান্সেট* যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছে। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে সেই প্রবন্ধের অনেকটাই আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম। প্রবন্ধটি লিখেছেন—**পিটার রডরিক, রুশিকেষ মহাজন, প্যাট্রিসিয়া ম্যাকগেট্টিগান ও অ্যালিসন এম পোলক।**

ল্যান্সেট বলেছে, ''আইন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এক নতুন বিশ্লেষণ দেখিয়েছে, ২০১৩ সালের 'ইন্ডিয়ান ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট)' বিল ওষুধের যুক্তিসঙ্গত, নিরাপদ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

ভারতে নীতি-নির্ধারকরা সে দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কঠিন সমস্যাগুলো আটকানোর চেষ্টা করছেন, অনেক রিপোর্টে বহুবিধ সমস্যার কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও অকার্যকারিতা, নিরাপদ ও কার্যকর ওষুধ মানুষের নাগালের মধ্যে আনার ব্যর্থতা, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলোতে নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের (ওষুধ-মিশ্রণ, যাতে একাধিক ওষুধ মিশিয়ে একটা 'প্রোডাক্ট' হিসাবে বাজারজাত করা হয়; এতে ওষুধগুলোর অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়) অতি মাত্রায় ব্যবহার। এইসব সমস্যার প্রতিবিধান হিসাবে 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট)' বিল ভারতের পার্লামেন্টে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে প্রথম আনা হয়েছিল। ২০১৩ সালের শেষে এর দু-টো প্রধান স্তম্ভ—বর্তমান নিয়ন্ত্রক 'সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' (CDSCO), চাইতে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন কেন্দ্রীয় ড্রাগ অথরিটি তৈরি করা এবং এই নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা বাড়িয়ে আমদানি করা ওষুধগুলোও তার আওতায় আনা—এ দু-টোই পার্লামেন্টারি কমিটি নাকচ করেছে। অথচ ২০১২ সালের মে মাসে এই পার্লামেন্টারি কমিটিই CDSCO-কে নির্মমভাবে সমালোচনা করেছিল।

THE LANCET
Middle East Edition
Articles
Mechanisms of Disease
Viewpoint
Contains Selected Articles from
THE LANCET
www.thelancet.com

২০১২ সালে ভারতের পার্লামেন্টের 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি CDSCO-র যে ''ওষুধ শিল্পের আশা . . . দাবি ও চাহিদা পূরণ . . . ''-এর উদ্দেশ্যে কাজ করছে তাকে সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন, CDSCO নতুন ওষুধকে অনুমতি দেওয়ার জন্য সহজ রাস্তা নিচ্ছে ও আইনি পথকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ওষুধ কোম্পানিগুলো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, বিশেষ করে ভারতে করা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছাড়াই নতুন ওষুধ বাজারে ছাড়ার পথ নিচ্ছে, আর 'খুব বেশি সংখ্যায়' ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধ CDSCO-র অনুমতি ছাড়াই রাজ্যের নিয়ন্ত্রকদের হাতে ছাড়পত্র পেয়ে বাজারে আসছে, CDSCO নিষ্ক্রিয়।। ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ভারতের ওষুধ বাজারে একটা বড়ো সমস্যা, আর ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নতুন নতুন নামের নানা কম্বিনেশন অনুমতি পেয়েছে।''

ল্যান্সেটের মতে, ভারতের পার্লামেন্টারি কমিটি CDSCO-কে যে সমালোচনা করেছিল, সেই সমালোচনার পরে কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে কমিটি ব্যর্থ হয়েছে। *ল্যান্সেটের* প্রবন্ধ লেখকেরা এই মতে উপনীত হওয়ার আগে ভারতের ওষুধ-সংক্রান্ত আইন ও তার সংশোধনীগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন। তাঁরা বলছেন, ''বিগত ৪২ বছর ধরে ভারতে যেসব ওষুধ অনুমতি পেয়েছে আর যেসব ওষুধ সংক্রান্ত আইন গত সাত দশক ধরে এদেশে প্রণয়ন করা হয়েছে, আমরা (লেখকেরা) সেসব খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে চাইছি আইনি পরিবর্তনের ফলে ওষুধ-অনুমতির ধরন পালটায় কি না। আর তারপর সেই আলোকে আমরা ২০১৩ সালের হিসেবে 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট)' বিলটা খতিয়ে দেখতে চেয়েছি।

১৯৭১-২০১২ সালের মধ্যে CDSCO ২০৭২টি অনুমতি দিয়েছিল। তার মধ্যে ১৮৭৪টি (৬৩%) হল এক ওষুধ, আর ১০৯৮টি (৩৭%) হল ওষুধ-মিশ্রণ, অর্থাৎ ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন। বছরওয়ারি হিসাবে ২০০৫-২০১১ এই সাত বছরে সবচেয়ে বেশি অনুমতি দেওয়া হয়েছে—৭৬৩টি এক-ওষুধ, আর ৬৮৯টি ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন। ২০১২-তে কিন্তু অনুমতির হার খুব কম ৩৫টি এক-ওষুধ, আর ৯টা মাত্র ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন।

ভারত ২০০৫ সালে ওষুধশিল্পে 'প্রোডাক্ট পেটেন্ট' পুনরায় চালু করে (আগে ছিল 'প্রসেস পেটেন্ট', যাতে একটি কোম্পানির আবিষ্কৃত কোনো একটি ওষুধ অন্য কোম্পানি তৈরি করতে পারত, কিন্তু তৈরি করার পদ্ধতি আলাদা হতে হত। 'প্রোডাক্ট পেটেন্ট' চালু থাকলে যে কোম্পানি ওষুধটির পেটেন্ট নিয়েছে তারাই কেবল ওষুধটি তৈরি করতে পারে বা নিজের ইচ্ছেমতো অন্য কাউকে করার অধিকার বেচতে পারে—*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*)। কিন্তু ২০০৫-২০১১ সাল এই সময়ে ওষুধ অনুমতির ও ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন বাড়ার যে হিড়িক লেগেছিল, সেটার জন্য 'প্রোডাক্ট পেটেন্ট' নীতি দায়ী ছিল বলে মনে হয় না। নিয়ন্ত্রক সংস্থার অকর্মণ্যতার সুযোগে অনুমতি পাওয়ার হার এভাবে বেড়ে গিয়েছিল বলেই বরং মনে হয়।

এরপর *ল্যান্সেটের* লেখকেরা ভারতের ওষুধ আইনগুলোর পর্যালোচনা করে বলেছেন: ''ভারতের ওষুধ আইনগুলো খতিয়ে দেখতে গেলে কয়েকটা সিদ্ধান্ত অনিবার্য মনে হয়।''

এক, বর্তমান ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট পুরোনো ও ত্রুটিপূর্ণ। এর প্রাথমিক রূপটির মূল অংশ ১৯৪০ সালের আইন, আর তারপর অন্তত দশবার একে সংশোধন করা হয়েছে। বাজারে ছাড়ার আগে সমস্ত ওষুধ নিরাপদ আর কার্যকর কি না সেটুকু দেখে নেওয়ার দায়িত্বও নিয়ন্ত্রকের নেই। নতুন ওষুধের ক্ষেত্রেই কেবল এই বাধ্যবাধকতা ঢোকানো হয়েছে, তাও ২০০১ সালে করা এক অপ্রধান নিয়ম হিসেবে। আবার, ২০১৩ সালের যে বিলটার কথা এখানে হচ্ছে, সেখানেও বর্তমান আইনে কার্যকারিতা এবং ফলপ্রসূতা (effectiveness and efficacy) এ দুয়ের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, আর ফলপ্রসূতার (efficacy) কথা এই আইনের এক নতুন লম্বা টাইটেলে লেখা হয়েছে। কক্রেন কোলাবরেশন ফলপ্রসূতার (efficacy) সংজ্ঞা দিয়েছে, ''কোনো চিকিৎসা / পদক্ষেপ আদর্শ অবস্থায় যতটা উপকার করতে পারে'', আর কার্যকারিতার (effectiveness) সংজ্ঞা দিয়েছে, ''কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা / পদক্ষেপ, সাধারণভাবে যেমন অবস্থায় সেটা প্রয়োগ করা হয়, সেই অবস্থায় তার কাজ যতটা করতে পারে।'' নতুন ওষুধগুলো 'ব্যবহারের জন্য কার্যকর' (effective for use)—২০০১ সাল থেকে এই কথাটা আইনে লেখার ফলে ওষুধের বিষয়ে যে উচ্চ মান দাবি করা হল সেটা ফলপ্রসূতার (efficacy) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়; শেষেরটি 'আদর্শ অবস্থায়' মাপা হয়, আর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে খুব নির্দিষ্ট একদল মানুষের জন্যই সেটা করা হয়। কার্যক্ষেত্রে সেটা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ২০১৩ সালের বিল কিন্তু এ দু-টো গুলিয়ে ফেলেছে, ফলে কার্যকারিতা (effectiveness) যাচাই করার দরকারটাই ধাক্কা খেয়েছে।

দুই, ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয়ভাবে করার কিছু সমস্যা আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় সরকার (আমদানি করা ওষুধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত) আর রাজ্য সরকার (দেশে ওষুধ তৈরি, বণ্টন ও বিক্রির দায়িত্বপ্রাপ্ত) এ দুয়ের দায়িত্বের বণ্টন যে পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে করা হয়েছিল, সেটা নিশ্চিতভাবে লোপ পায়, আর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালে নতুন নিয়মে কোনো নতুন ওষুধ আমদানি করার আগে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার লিখিত অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হল। ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলোকে নির্দেশ দেওয়ার ভার নিজের হাতে নিলেন। ১৯৬১ সালের জুন মাসে আবার নতুন নিয়ম; সেখানে বলা হল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকের অনুমতি ছাড়া নতুন ওষুধ তৈরি করা যাবে না, আর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রককে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তথ্য খতিয়ে দেখার অধিকার দেওয়া হল। ১৯৮২ আর ২০০৮ সালে করা আইন-সংশোধন কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দিষ্ট কারণে কোনো ওষুধকে জনস্বার্থে নিয়ন্ত্রণ, ও নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দিল।

২০১৩ সালের এই বিলটার ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়বে, আর তার ফলে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর প্রভাব ও ক্ষমতা বাড়বে। 'ক্ষুদ্র-মাঝারি ওষুধ শিল্পের কনফেডারেশন'-এর সভাপতি শ্রী জগদীপ সিং এই বিলের বিরোধিতা করে বলেছেন, ''ড্রাগ লাইসেন্স দেওয়া ব্যাপারটি কেন্দ্রীয় স্তরে হলে ক্ষুদ্র-মাঝারি ওষুধ শিল্পের মৃত্যু ঘটবে, এবং শক্তিশালী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাত আরও শক্ত হবে। বাজারে সমানে সমানে টক্কর হওয়ার মতো নিয়ম এমনিতেই নেই, আর বড়ো ওষুধ কোম্পানিগুলো ক্ষুদ্র-মাঝারি ওষুধ কোম্পানিদের টিকে থাকা অসম্ভব করে তুলছে।''

তিন, ভারতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বিষয়ে আইনগুলো ভালোভাবে তৈরি নয়, আর ২০০৫ সালের সংশোধনীর ফলে সেগুলো আরও দুর্বল হয়েছে। ১৯৮৮ সালের সংশোধনী আইনবলে কোনো 'নতুন ওষুধ' ভারতে 'আবিষ্কৃত' হলে ভারতে তার ট্রায়াল একবারে প্রথম স্তর (phase 1) থেকে করতে হত, আর 'অন্য দেশে আবিষ্কৃত' হলে সেটার ট্রায়াল ভারতে তৃতীয় স্তর (phase 3) থেকে করতে হত। কিন্তু এই সময় আইন ঠিকভাবে বানানো হয়নি, ওষুধ কোম্পানির বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, সাধারণ ক্ষেত্র হিসাবে না বলে কেবল উদাহরণ দেওয়া; ভাষাতে সমস্যা আছে— করণীয় বিষয় না লিখে এগুলো প্রায়শই বিবরণ দেওয়ায় সীমাবদ্ধ, আর কে করবেন সেটা না বলে ভাববাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর ২০০৫ সালের সংশোধনীতে ওষুধ ট্রায়ালে কমপক্ষে কতজনকে রাখতে হবে, বা নানা বয়স নানা জনগোষ্ঠীর মানুষকে রাখার বাধ্যবাধকতার বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। নতুন (২০১৩) বিলে এইসব ত্রুটির দিকে নজর দেওয়া হয়নি, কীভাবে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালাতে হবে সেটাই কেবল বলা হয়েছে, আর কখন ট্রায়াল দরকার সেটা বলাই হয়নি।

এছাড়া ভারতের বর্তমান ওষুধ আইনবলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক নিজে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আর সে ব্যাপারে স্বচ্ছতা আর দায়ভার গ্রহণ, এ দুয়েরই অভাব রয়েছে। ১৯৮৮ সালের আইন অনুসারে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক (অর্থাৎ CDSCO) ''যদি ওষুধটা তেমন ধরনের হয় তবে জনস্বার্থে অন্য দেশের (ট্রায়ালে পাওয়া) তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এদেশে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফল জমা দেওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে (the public interest override)। ২০০৫ সালে ভারতে কোনো রোগের ভয়াবহতা ও প্রাদুর্ভাব অনুসারে সে রোগের চিকিৎসার জন্য নতুন ওষুধের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে CDSCO-কে আবার একটা অতিরিক্ত নিজের বিবেচনামতো, তথ্য ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল (the disease override)। CDSCO কিন্তু কী কারণে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, সে ব্যাপারে কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়, আর জনসাধারণের ব্যাপারটা জানারও কোনো অধিকার নেই। এইসব বিষয়, বিশেষ করে ভারতীয়দের ওপর ট্রায়াল না চালালেও অনুমতি পাওয়ার বিষয়টা, সর্বত্র ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু ২০১৩ সালে নতুন বিল এসব ব্যাপারে কিছুই বলেনি।''

ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন (ওষুধ-মিশ্রণ) ওষুধের সমস্যা নিয়ে *ল্যান্সেটে* লেখকেরা খুব চিন্তিত। তাঁরা বলছেন, ''ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সরকারি মহলে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধের সমস্যাটা আলোচিত হচ্ছে। ১৯৮৮ সালের আগে পর্যন্ত আইনে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধের উল্লেখ ছিল না। ১৯৮৮-তে সেটা ঢোকানো হল ঠিকই, কিন্তু এই অংশটা একেবারে বাজেভাবে লেখা হল এবং তারপর থেকে অনেকবার সংশোধন করা হয়েছে। ২০০১ সালে নিয়ন্ত্রকের ওপর এইসব ওষুধের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা দেখার ভার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ২০০৫ সালে এই ধরনের ওষুধের তথ্য জমা করার দরকার কমানো হল। আমাদের (লেখক) বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে, তিন জায়গায় সমস্যা রয়েছে।

এক, ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধ (ওষুধ-মিশ্রণ) বলতে কী বোঝানো হয়েছে, ১৯৮৮ সালের নিয়মে সেটা পরিষ্কার নয়। ১৯৮৮ থেকে 'ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধ', যাদের মধ্যে থাকা প্রতিটা ওষুধ আলাদা আলাদা করে অনুমোদনপ্রাপ্ত, সেগুলো তৈরি ও আমদানি করার জন্য CDSCO-এর কাছে আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আবেদনপত্রের সঙ্গে তথ্য জমা করা হয়েছে ১৯৪৫ সালের ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্টের সিডিউল Y এর অ্যাপেন্ডিক্স VI অনুসারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ওই অ্যাপেন্ডিক্স VI-তে উল্লিখিত চার রকম 'ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধ'-এর কোনোটার ক্ষেত্রেই ওষুধ-মিশ্রণের মধ্যে থাকা প্রতিটা ওষুধ আলাদা আলাদা করে আগে থেকেই অনুমোদন প্রাপ্তির দরকার নেই (প্যানেল ১ দেখুন)। তা ছাড়া, ১৯৮৮-র নিয়মে মাত্র দু-ধরনের 'ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধ'-কে নতুন ওষুধের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে, আর অ্যাপেন্ডিক্স VI-তে উল্লিখিত চার রকম ওষুধের বিবরণের ভাষার সঙ্গে একই ভাষায় তাদের বিবরণ দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে 'টাইপ ৪' ওষুধ-মিশ্রণ, যেখানে 'ওষুধ প্রয়োগের সুবিধা ছাড়া মিশ্রণে আর কোনো সুবিধার দাবি নেই' বলা হচ্ছে, সেটা উদ্বেগজনক, কেননা ওষুধ-মিশ্রণের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা সংক্রান্ত তথ্য জমা দেওয়ার দায় নেই। আর ২০০৫ সালে আবার এই দলভুক্ত ওষুধের সংখ্যা বেড়ে গেছে, কেননা এখন ওষুধ-মিশ্রণে শুধু প্রমাণিত ওষুধটাই নয়, সেই ধরনের সব ওষুধ (drugs from the same class) যাদের একটা নির্দিষ্ট কারণে অনেকদিন ধরে ব্যবহার করা হয়েছে, তাদেরও ঢোকানোর অনুমতি দেওয়া হল। ২০১৩ সালের বিলে ওষুধের বিবরণের এই অসামঞ্জস্য দূর করার, বা 'টাইপ ৪'- 'কেবল সুবিধার জন্য করা ওষুধ-মিশ্রণ'-এর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতার এই বিরাট ফারাক ঘোচানোর কোনো চেষ্টাই নেই।

প্যানেল-১

১৯৮৮ সালের নিয়মানুসারে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের ধরন ও তাদের অনুমতি পাওয়ার জন্য তথ্য জমা দেওয়ার পদ্ধতি।

ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স রুলস ১৯৪৫-এর সিডিউল Y-এর অ্যাপেন্ডিক্স VI, ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স (সংশোধন ৮) রুলস ১৯৮৮, ৪ রকম ওষুধ-মিশ্রণ চিহ্নিত করেছে।

টাইপ ১

প্রথম দলে আছে সেইসব ওষুধ-মিশ্রণ যাদের মধ্যেকার এক বা একাধিক ওষুধ হল নতুন ওষুধ।

এইসব ওষুধ-মিশ্রণকে যেকোনো অন্য নতুন ওষুধের মতো বলেই ধরতে হবে, এবং এদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারটা সেভাবেই হবে।

টাইপ ২

দ্বিতীয় দলে আছে সেইসব ওষুধ-মিশ্রণ যাদের মধ্যেকার সমস্ত ওষুধ হল অনুমতিপ্রাপ্ত বা আলাদা করে বাজারে চালু, কিন্তু মিশ্রণ হিসেবে এর আলাদা কার্যকারিতার দাবি করা হচ্ছে, আর যাদের মধ্যেকার ওষুধগুলোর মধ্যে (pharmacodynamic or pharmacokinetic) আন্তঃক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করার জন্য সমস্ত ফার্মাকোলজিক্যাল, টক্সিকোলজিক্যাল, ও ক্লিনিক্যাল তথ্য দিয়ে, ও মিশ্রণ করার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে, আবেদন করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটা ওষুধেরও যে মিশ্রণ করা হচ্ছে তার তীব্র বিষণ তথ্য [acute toxicity data (LD 50)] ও ফার্মাকোলজিক্যাল তথ্য জমা করতে হবে। যদি ওই ওষুধ-মিশ্রণের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অন্য দেশে করা হয়ে থাকে, তার রিপোর্ট জমা করতে হবে। যদি অন্য দেশে মিশ্রণটি বাজারে চলে, সেই দেশে নিয়ন্ত্রণ-অবস্থা বলা দরকার। (এদেশে) বাজারজাত করার জন্য ওষুধ-মিশ্রণটির এদেশে করা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের রিপোর্ট দেওয়া দরকার। ঠিক কী ধরনের ট্রায়াল করতে হবে তা ওষুধ-মিশ্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে কেমন দাবি করা হচ্ছে, আর কীরকম তথ্য ইতিমধ্যেই আছে, তার ওপর নির্ভর করবে।

টাইপ ৩

তৃতীয় দলে আছে সেইসব ওষুধ-মিশ্রণ যারা বাজারে চালু আছে, কিন্তু তার মধ্যেকার ওষুধগুলোর অনুপাত পরিবর্তন করতে চাওয়া হচ্ছে, বা নতুন কোনো কার্যকারিতা দাবি করা হচ্ছে। এদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অনুমতি পেতে হবে, আর সেই ট্রায়ালের রিপোর্ট জমা করে বাজারজাত করার অনুমতি পেতে হবে। ঠিক কী ধরনের ট্রায়াল করতে হবে তা ওষুধ-মিশ্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে কেমন দাবি করা হচ্ছে, আর কীরকম তথ্য ইতিমধ্যেই আছে, তার ওপর নির্ভর করবে।

টাইপ ৪

চতুর্থ দলে আছে সেইসব ওষুধ-মিশ্রণ যাদের মধ্যেকার সমস্ত ওষুধই সুনির্দিষ্ট কারণে অনেক বছর ধরে আলাদা করে বাজারে চালু আছে, তাদের একত্রে ব্যবহার করা অনেক সময় দরকার এবং মিশ্রণ হিসাবে কেবল (খাওয়া বা অন্যভাবে প্রয়োগের) সুবিধা ছাড়া অন্য কিছুই দাবি করা হচ্ছে না আর মিশ্রণের মধ্যেকার ওষুধগুলোর মধ্যে (pharmacodynamic or pharmacokinetic) আন্তঃক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। এদের ক্ষেত্রে আলাদা করে মানুষ বা জীবজন্তুর ওপর প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহের সাধারণভাবে দরকার নেই, এবং ওষুধ-মিশ্রণের যৌক্তিকতা আছে মনে হলে বাজারজাত করার অনুমতি দেওয়া হবে।

দুই, ২০০৫ সালে (ওষুধ-মিশ্রণের) অনুমতি পাওয়ার জন্য তথ্য জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে কমানো হয়েছে (অ্যাপেন্ডিক্স দ্রষ্টব্য)। ওপরের চার রকম (সিডিউল Y-এর অ্যাপেন্ডিক্স VI) ওষুধ-মিশ্রণের অনুমতির জন্য তথ্য জমা দেওয়ার কায়দা আলাদা। 'টাইপ ৪' ধরনের ওষুধ-মিশ্রণের সুবিধা আরও বেশি মিশ্রণকে পাইয়ে দিয়েছে ২০০৫ সালের সংশোধনী। তা ছাড়া, 'টাইপ-১' ধরনের ওষুধ-মিশ্রণের ক্ষেত্রেও তথ্যের গুরুত্ব কমানো হয়েছে; একেবারে 'নতুন ওষুধের মতো তথ্য জমা দেওয়ার' প্রয়োজনীয়তা খারিজ করে 'নতুন ওষুধের অনুরূপভাবে তথ্য জমা দেওয়ার' কথা বলা হয়েছে। ফলে ১৯৮৮-তে যে সুনির্দিষ্টতা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। আর ২০০৫ সালে এইসব তথ্যকে বোধহয় ভুল করেই 'মার্কেটিং ডাটা' বলে অভিহিত করা হয়েছে—এই ভুলটাও খুব ইঙ্গিতপূর্ণ।

২০০৫-এর সংশোধনীতে 'টাইপ ২' ওষুধ-মিশ্রণের অনুমতির জন্য ভারতীয় রোগীদের ওপর ট্রায়াল করার কথা বাদ দিয়ে গেছে, আর 'টাইপ ৩' ওষুধ-মিশ্রণের অনুমতির জন্য কোনোরকম ট্রায়াল করার কথাই বাদ দিয়েছে, অর্থাৎ এগুলোর গুরত্ব কম। বিশেষ করে 'টাইপ ২' ওষুধ-মিশ্রণের জন্য এই ছাড় দুশ্চিন্তার বিষয়, কেননা এই টাইপে মিশ্রণের বিভিন্ন ওষুধের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে বলা হচ্ছে। ২০১৩ সালের বিল এটা নিয়ে কিছুই বলেনি।

শেষত, ভারতের ওষুধ-মিশ্রণ সংক্রান্ত আইন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধ বিষয়ক নির্দেশিকার সঙ্গে খাপ খায় না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা ভারতের ২০০৫ সালের সংশোধনীর পরে করা। ওষুধ-মিশ্রণের শ্রেণিবিভাগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অন্যভাবে করেছে (প্যানেল ২ দ্রষ্টব্য), আর তার ভিত্তি হল মিশ্রণের ওষুধগুলোর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা কতটা প্রমাণিত, সেটাই। বিপরীতপক্ষে, ভারতীয় শ্রেণিবিভাগে টাইপ ২ আর টাইপ ৪-এর ক্ষেত্রে মিশ্রণের মধ্যেকার ওষুধগুলোর মধ্যে (pharmacodynamic or pharmacokinetic) আন্তঃক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা, আর ওষুধ প্রয়োগের সুবিধা—এইসব দেখেছে। মোটাদাগে বলতে গেলে, ভারতীয় 'টাইপ ১' অনেকটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ধরন ৪', এবং ভারতীয় 'টাইপ ২ ও ৩' অনেকটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ধরন ৩'—এদের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত কি না সেটা উল্লেখ না করে, ভারতীয় শ্রেণিবিভাগের বিবরণে আগে অনুমতি দেওয়া হয়েছে বা বাজারজাত করা হয়েছে কি না সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কখনোই করেনি।

প্যানেল ২

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুসারে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের শ্রেণিবিভাগ

কোনো একটে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ফিনিশড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট (FDC-FPP)-কে নথিভুক্ত করতে গেলে তার আবেদনপত্র নীচের চারটি ধরনের মধ্যে কোনো একটা ধরনের হবে। প্রতিটা ধরনের জন্য আলাদা আলাদা জিনিস প্রয়োজন।

ধরন ১। নতুন ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ফিনিশড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টটিতে (FDC-FPP) অন্য কোনো FDC-FPP-র মতো একই ওষুধ একই মাত্রায় আছে; অন্য ভাষায়, সেটা চালু এক FDC-FPP-র 'জেনেরিক রূপ'। এটার গুণমান, নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত।

ধরন ২। কয়েকটি ওষুধ চিকিৎসায় একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, নতুন ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ফিনিশড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টটিতে (FDC-FOO) সেইসব এক-রাসায়নিকবিশিষ্ট ওষুধের মতো একই কার্যকর রাসায়নিকটি একই মাত্রায় আছে। বা, কিছু চিকিৎসায় এক-রাসায়নিকবিশিষ্ট ওষুধের কয়েকটি ও FDC- একসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে; যেমন দু-টো এক-রাসায়নিক- বিশিষ্ট ওষুধ ও তার সঙ্গে একটা FDC, এই FDC-র মধ্যে আবার দু-রকম কার্যকর রাসায়নিক আছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই এই একসঙ্গে ব্যবহৃত ওষুধসমূহের সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা থাকতে হবে, এবং যে-সমস্ত ফিনিশড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট (FPP) ক্লিনিক্যাল প্রমাণ সংগ্রহে ব্যবহার করা হবে সেগুলো যথাবিহিত মানের হতে হবে।

ধরন ৩। নতুন ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ফিনিশড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টটিতে (FDC-FPP) কার্যকর রাসায়নিকগুলো সবকটিরই নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত, কিন্তু যে অসুখে কাজে লাগবে বলে দাবি করা হচ্ছে সেখানে রাসায়নিকগুলো একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়নি। নতুন FDC-FPP টিতে যে মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছে তার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত, কিন্তু অন্য ডোজে ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে।

ধরন ৪। নতুন ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ফিনিশড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টটিতে (FDC-FPP) এক বা একাধিক নতুন রাসায়নিক আছে। (WHO Technical Report Series, No.929, 2005. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, 39th Report)

ওপরের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকায় এমনভাবে এগোনোর কথা বলা আছে যাতে ওষুধ-মিশ্রণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো চেনা যায়, সেগুলোর প্রমাণ জেনে-বুঝে যাচাই করে অনুমতি চাইতে আবেদন করতে হয়।

এই নির্দেশিকায় বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রীয় বিষয় একদিকে, আর দাম ও জোগাড় করার বিষয়গুলো অন্যদিকে ধরে বিচার করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, শেষোক্ত বিষয়গুলো ''নিজবলে কোনো ওষুধ-মিশ্রণকে অনুমতি দেওয়ার যথেষ্ট কারণ হতে পারে না, যদি সেই মিশ্রণ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রীয় নীতিসমূহ ও তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হয়।'' এছাড়া স্রেফ 'সুবিধা'-র খাতিরে কোনো ওষুধ মিশ্রণকে অনুমতি দেওয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই নির্দেশিকার বিরোধী, এখানে 'সুবিধা' ব্যাপারটা অন্য সব শর্ত পূরণের পাশাপাশি গণ্য করা যাবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকায় বলা হচ্ছে যে ধরন ৩ ও ধরন ৪—এই দুই অবস্থায় নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা সংক্রান্ত তথ্য জমা দিতেই হবে। 'সাধারণভাবে' ধরন ৩ ও ধরন ৪ এই দুই অবস্থায় সেটা জমা দেওয়ার

দরকার নেই— কিন্তু নিয়ন্ত্রকরা প্রতিটা আবেদনপত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ও যুক্তি সহকারে যাচাই করবেন। ভারতের ২০০৫ সালের অ্যাপেন্ডিক্স VI-এর সংশোধনী একেবারে অন্য কথা বলছে, মনে হচ্ছে যেন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

নতুন ওষুধ আইন সম্পর্কে *ল্যান্সেটের* প্রাবন্ধিকদের অভিমত হল, "২০০৫-২০১১ সময়পর্বে ভারতে রেকর্ড সংখ্যক এক রাসায়নিক ওষুধ ও ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের অনুমতিদান বোধহয় ১৯৮৮ সালের অ-যথাযথ নিয়ম ও ২০০৫ সালের ফসকা গেরো সংশোধনী— এদেরই মিলিত ফল। বিশেষ চিন্তার বিষয় হল, ২০০৫ সালে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের নিয়মকানুন শিথিল করা হল, আর কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা (CDSCO), যেটা কিনা কোনোরকম দায়বদ্ধতা বা নীতিস্বচ্ছতা দ্বারা আবদ্ধ নয়, তার হাতে নিজের বিবেচনা মাফিক অনুমতি দেওয়ার দ্বিতীয় দফা ক্ষমতা দেওয়া হল। ফলে ওষুধ-মিশ্রণ চালু করার জন্য তথ্যের প্রয়োজন কার্যক্ষেত্রে কমে গেল, আর 'প্রয়োগের সুবিধার জন্য' ওষুধ-মিশ্রণ বেশি জায়গা পেল।

কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা (CDSCO) কোনো ওষুধের (কার্যকারিতা ও নিরাপত্তার) প্রমাণ দর্শায় না, তা সে সেটাকে অনুমতি দিক বা না দিক। সুতরাং কোন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল তথ্য কোন অনুমতির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, বা কোন তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ কোন ওষুধ-মিশ্রণের আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেসব বোঝার কোনো উপায় নেই। জনসাধারণের আস্থা অর্জনের জন্য CDSCO-কে এক-রাসায়নিক ওষুধ ও ওষুধ-মিশ্রণের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তার প্রমাণ বিচার কেমনভাবে করেছে সেটা প্রকাশ করা দরকার; এবং যেখানে CDSCO তার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে, তার কারণ দেখানো দরকার।

২০১৩ সালের বিল এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ, আর যেসব নিয়ন্ত্রণ সমস্যা নিয়ে এতক্ষণ বলা হল, সে ব্যাপারেও চুপ। এটাও অদ্ভুত যে গত মাসের (ডিসেম্বর ২০১৩) ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক (পার্লামেন্টারি) স্ট্যান্ডিং কমিটিও এইসব ব্যাপারে কিছু বলেনি।

২০১৩ সালের বিল বিশেষ দুশ্চিন্তার বিষয়, কেননা এটা নতুন কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রককে কোনো আইনি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যস্থির করে দিচ্ছে না; নিয়ন্ত্রককে নতুন ওষুধের কার্যকারিতা সম্পর্কে দায়িত্ব দিচ্ছে না; আর কার্যকারিতা এবং ফলপ্রসূতা (effectiveness and efficacy) এ-দুটোকে আলাদা করার যে ব্যর্থতা বর্তমান আইনে রয়েছে, সেটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওষুধ বাজারজাত করার অনুমতি পাওয়ার জন্য সাধারণভাবে র‍্যান্ডোমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল ব্যবহৃত হয়, সেখানে 'ফলপ্রসূতা' (efficacy) দেখা হয়, কার্যকারিতা (effectiveness) নয়। তাই বাজারজাত করার প্রথম অনুমতি সাময়িক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনা থেকেই সেই অনুমতি প্রত্যাহৃত হবে। পাকাপাকি অনুমতি তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন বাস্তব সমস্যায় ব্যবহারের পরে কোনো ওষুধের কার্যকারিতার (effectiveness) প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই পদ্ধতি কার্যকারিতা এবং ফলপ্রসূতা এ-দুয়ের গুরুত্বপর্ণ পার্থক্যকে যথাযথ মর্যাদা দেয়, বাজারজাত করার পরে সমীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াতে জোর দেয়, আর বিশ্ব জুড়ে ওষুধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

২০১৩ সালের 'ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল' খুঁটিনাটি বুঝে ওষুধের কার্যকারিতা, নিরাপত্তা, যৌক্তিকতা ও ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রণের মূল সমস্যা খুঁটিয়ে বুঝে শক্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ব্যর্থ। সত্যি বলতে কি, এই আইন সে চেষ্টাও করেনি। বরং ৭৪ বছরের প্রাচীন স্বাধীনতা-পূর্ব এক আইনের ওপর তালি মারার চেষ্টাই করেছে, যে আইনের কাঠামোটা সময়ের চাপে ভেঙে পড়েছে।"

শেষ অবধি, *ল্যান্সেটের* প্রবন্ধকারেরা বিনীতভাবে কিছু সুপারিশ রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, "আইন-প্রণেতারা হয়তো এই বিলটির একটু সংশোধন চাইতে পারেন যাতে জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি পোক্ত হয়, তাই আমরা কিছু সুপারিশ এখানে রাখলাম (প্যানেল ৩)।

প্যানেল ৩

ভারতীয় ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৩-এর জন্য কিছু সংশোধনী প্রস্তাব

- নতুন কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে আইনি উদ্দেশ্য দেওয়া হোক, যে উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকবে নিরাপদ, কার্যকর ও উচ্চ-গুণমানসম্পন্ন ওষুধের অনুমতি প্রদান, যে ওষুধগুলো হবে প্রয়োজনীয় ও চিকিৎসার জন্য যথার্থ।
- নিয়ন্ত্রকের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হোক যে নতুন ওষুধ-মিশ্রণসহ সকল নতুন ওষুধ হবে নিরাপদ, কার্যকর, উচ্চ-গুণমানসম্পন্ন; এবং অনুমতিদানের আগে দেখতে হবে যে ওষুধগুলো যেন চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় হয়।
- নিয়ন্ত্রকের জন্য একটা সাধারণ ছক তৈরি করা হোক যাতে জাতীয় প্রয়োজন ও চিকিৎসার ঔচিত্য বুঝে তাঁরা নতুন ওষুধ অনুমতি দেন।
- কখন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দরকার সেটা পরিষ্কার করে বলা হোক, বিশেষ করে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের জন্য, আর ভারতীয় রোগীদের নিয়ে ট্রায়াল সম্পর্কে।
- 'জনস্বার্থ' ও 'বিশেষ রোগ'—এ দুয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রকের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারটা ঠিকভাবে রাখা হোক, আর নিয়ন্ত্রককে কখন কী কারণে এই বিশেষ ক্ষমতা তাঁরা প্রয়োগ করেছেন সেটা লিখিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।
- নতুন ওষুধকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রথম অনুমতি দিতে হবে, আর তারপর ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকারিতার আরও নিশ্চিত প্রমাণ পেলে তবেই সেটার সুনিশ্চিত অনুমতি দেওয়া হোক।
- ভারতের ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন সংক্রান্ত আইনগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি করা হোক, বিশেষ করে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনগুলোকে নতুনভাবে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করা হোক, আর সুবিধা ও অসুবিধার পাল্লা মেপে দেখা হোক।
- সমস্ত চালু ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনগুলোর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা যাচিয়ে দেখা হোক, অনেকটা ১৯৬২ সালে আমেরিকার কংগ্রেস যেমন আইন করে যাচিয়ে দেখার হুকুম দিয়েছিলেন, সেইভাবে।
- ভারতের বাজারে যত ওষুধ চালু আছে সবগুলোর কিছু সময় অন্তর যাচিয়ে দেখা হোক যে সেগুলো জনগণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনে কাজে লাগার মতো আছে কি না।

ল্যান্সেটের প্রবন্ধকারেরা ইতি টেনেছেন এই কথা বলে যে, ‘‘কিন্তু সত্যিকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, যেটা বিশ্বের ওষুধ বাজারে ভারতের অবদানের সঙ্গে মাপসই ও তার জন্যও দরকারি, সেটা আনার জন্য আইন প্রণয়ন- কারীদের দূরদৃষ্টি দরকার, যাতে তাঁরা নতুন ওষুধ আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। সেই আইনে পরিষ্কারভাবে লেখা নিয়মাবলি থাকবে, আর তার সাহায্যে জনগণের প্রয়োজনের আলোকে ওষুধের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা প্রমাণ করে এমন তথ্য খুঁটিয়ে ও স্বচ্ছভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে।”

অনুবাদ : ‘স্বাস্থ্যের বৃত্তে’-র কার্যকরী সম্পাদক জয়ন্ত দাস

With Best Compliment from

A. N. Pharmaceutical Laboratory

ADVT.

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ-বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজ্‌নে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ,

ফোন: ৯৮৩০৯২২১৯৪

ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্রে ওষুধ: একটি নৈতিক সমস্যা

জেনেরিক নামে ওষুধ লেখা আর নীতিসঙ্গত ওষুধের ব্যবহার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর অবশ্যকর্তব্য। তবে সরকার এ ব্যাপারে সতর্ক ও কড়া না হলে ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনৈতিক অতি-মুনাফা কমবে না, চিকিৎসা করাতে গিয়ে গরিব মানুষের ফতুর হওয়াও থামবে না— এ বি শেঠি ডেন্টাল কলেজের পেডোডনটিকস অ্যান্ড ডেন্টিস্ট্রি বিভাগের ডা. অমিতা এম হেগ্রের নির্দেশনায় এই গবেষণাপত্রটি তৈরি করে সেটি ম্যাঙ্গালোরে সদ্য অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা কনফারেন্সে পাঠ করেছেন—**ডা. কে কে প্রিয়াঙ্কা।**

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারতে ওষুধ শিল্প সর্বোন্নত, আর তাতে ২০০০-এরও বেশি ইউনিট রয়েছে। অপরদিকে, এদেশের মানুষের এক বড়ো অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। ওষুধ শিল্প ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হল চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী। কিন্তু সমাজে মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পৌঁছে দেবার চাইতে নিজের দু-পয়সা গুছিয়ে নেবার প্রবণতা জাঁকিয়ে বসেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, 'ওষুধ প্রমোশন' হল ওষুধ-প্রস্তুতকারী ও বিপণনকারী সমস্ত সংস্থা ওষুধের বিক্রি বাড়ানোর জন্য যা যা করে সবই; তার মধ্যে তথ্য জানানো আছে, আছে নানাভাবে প্ররোচিত করা। ওষুধ কোম্পানিরা তাদের বিক্রি বাড়াতে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে নানাভাবে 'ওষুধ প্রমোশন' করছে। আর অনৈতিকভাবে জোরদার 'ওষুধ প্রমোশন' করার ফলে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছেন, ফলে ওষুধ-জনিত খরচ বাড়ছে, বাড়ছে ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার। পরিশেষে দেখা যাচ্ছে গরিব মানুষ অত্যাবশ্যক ওষুধও পাচ্ছেন না।

ভারত সরকার জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেক আইন ও নিয়ম বানিয়েছেন। কিন্তু পরিস্থিতির এই সামগ্রিক অবনতি আটকাতে গেলে জনগণ ও চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের ওষুধ কোম্পানিগুলোর ওষুধ বিক্রির ফন্দিফিকিরগুলো বুঝতে হবে। জেনেরিক ওষুধ ব্যবহার করলে নানা কোম্পানির একচেটিয়া প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা ওষুধ কোম্পানিগুলোকে না-জেনে যেভাবে মুনাফা করতে সাহায্য করেন তা হল—ব্র্যান্ড নামে ব্যবস্থাপত্র লেখা, অত্যাবশ্যক নয় এমন ওষুধ লেখা, ও অযৌক্তিক ব্যবস্থাপত্র।

ব্র্যান্ড নামে ব্যবস্থাপত্র লেখা ১৯৯৫ সাল থেকে ৭২টি ওষুধ 'ওষুধ মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ' (Drug Prices Control Order, সংক্ষেপে DPCO)-এর অধীনে। অর্থাৎ অন্য সব ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে ওষুধ কোম্পানিগুলো। একই ওষুধ নানা কোম্পানি আলাদা আলাদা নামে ও আলাদা আলাদা দামে বাজারজাত করে, আর সেই দাম অনেক সময় প্রস্তুত করার খরচের চাইতে দশগুণ হয়। উদাহরণ দেখুন:

প্রস্তুতকারক কোম্পানি	ব্র্যান্ড নাম	জেনেরিক নাম	একটা ইঞ্জেকশন ওষুধের দোকানদার দাম পান (টাকা)	একটা ইঞ্জেকশন ওষুধের দোকানদার যে দামে বেচেন (এম আর পি) (টাকা)
ক্যাডিলা	অ্যামিস্টার ৫০০ মিলিগ্রাম	অ্যামিক্যাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম	৮.০০	৭০
জার্মান রিমেডি	অ্যামী ৫০০ মিলিগ্রাম	অ্যামিক্যাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম	৮.০০	৭০
ওকহার্ট	জেকাসিন ৫০০	অ্যামিক্যাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম	৯.৯০	৭০
অ্যালেম্বিক	অ্যামিকানেক্স ৫০০ মিলিগ্রাম	অ্যামিক্যাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম	৮.২২	৬৪.২৫
ইনটাস	ক্যামি ৫০০	অ্যামিক্যাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম	৮.১৩	৬০
ইউনিকেম	ইউনিমিকা ৫০০	অ্যামিক্যাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম	৭.৮০	৭২
র‍্যানব্যাক্সি	অ্যালফাকিম ৫০০	অ্যামিক্যাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম	৮.৫০	৭০
সিপলা	অ্যামিসিপ ৫০০	অ্যামিক্যাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম	৭.৪২	৭২

আবার একই কোম্পানি একই ওষুধ নানা নামে বাজারে ছাড়ে, আর তাদের স্টকিস্ট দাম বা এম আর পি দাম আলাদা হয়। যেমন দেখুন:

প্রস্তুতকারক কোম্পানি	ব্র্যান্ড নাম	জেনেরিক নাম	একটা ইঞ্জেকশন ওষুধের দোকানদার দাম পান (টাকা)	একটা ইঞ্জেকশন ওষুধের দোকানদার যে দামে বেচেন (এম আর পি) (টাকা)
সিপলা	অ্যালেরিড	সেট্রিজিন ১০ মিলিগ্রাম	২৮.৮৫	৩৭.৫০
সিপলা	সেটসিপ	সেট্রিজিন ১০ মিলিগ্রাম	১.৮৮	৩৩.৬৫
সিপলা	ওকাসেট	সেট্রিজিন ১০ মিলিগ্রাম	১.৮৪	২৭.৫০

চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভদের প্রভাবে ব্র্যান্ড নামে ব্যবস্থাপত্র লেখেন, অথচ কার্যকর ও কমদামি একই ওষুধ বাজারে রয়েছে। ফলে রোগী বেশি দাম দেন, আর কোম্পানি বেশি মুনাফা করে।

অত্যাবশ্যক নয় এমন ওষুধ লেখা: জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় ৩৪৮টি ওষুধ রয়েছে। এই তালিকার বাইরে রয়েছে অত্যাবশ্যক ওষুধের বিকল্প ও অযৌক্তিক ওষুধ; আর সেগুলোর দামই বেশি। হাতের কাছে ওষুধ বিষয়ে সঠিক তথ্য না থাকার ফলে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভদের ভ্রান্ত তথ্য গলাধঃকরণ করেন, আর তাতে রোগীদের খরচ বেশি হয়, ঝুঁকিও বাড়ে।

অযৌক্তিক ব্যবস্থাপত্র: কেবলমাত্র যখন কোনো ওষুধের দরকার আছে তখনই সেই ওষুধ লেখা উচিত। ওষুধ কোম্পানিগুলোর উগ্র প্রমোশন নীতির ফলে ওষুধের বিনামূল্যে স্যাম্পল, পেন ইত্যাদি ছোটোখাটো উপঢৌকন, এবং নানা কনফারেন্সে নিমন্ত্রণ এসব করা হয়। চিকিৎসকেরা এতে প্রভাবিত হন, আর তখন তাঁরা ওষুধ-প্রস্তুতকারকদের স্বার্থে ওষুধ লেখেন।

অনৈতিক ওষুধ প্রমোশনের ফল: ভারতের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশে রোগীরা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে ওষুধ কেনেন। চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা যেটি লেখেন তার বাইরে কিছু কেনার উপায় তাঁদের নেই, ফলে বহু দরিদ্র পরিবার ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়ে। অযৌক্তিক ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ নানা ক্ষতি করে। আবার, অ্যান্টিবায়োটিকের অযৌক্তিক ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের জন্ম দেয়।

ভারতে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

কেন্দ্রীয় ওষুধ মান ও নিয়ন্ত্রণ সংগঠন (Central Drug Standards and Control Organisation, সংক্ষেপে CDSCO) ওষুধের মান নির্ধারণ করে ও ওষুধের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও গুণমান সুনিশ্চিত করে। জাতীয় ফার্মাসিউটিক্যালস মূল্য নির্ধারণ নিয়ামক (National Pharmaceutical Pricing Authorities) DPCO-এর বাইরে থাকা 'বাল্ক ওষুধ' (ট্যাবলেট ইত্যাদি বানানোর আগের অবস্থায় পাইকারি হারে বিক্রিত হবার মাল) এবং তৈরি ওষুধ ----এদের দাম যথাযোগ্য সময় অন্তর নির্ধারণ করে। পেটেন্ট কন্ট্রোল আইন ভারতে ওষুধের ক্ষেত্রে পেটেন্ট পদ্ধতি লাগু করে ওষুধের দামের ওপর প্রভাব ফেলে। আর কেন্দ্রীয় সরকার 'ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ' (DPCO) বলে ভারতে বহুল-ব্যবহৃত কিছু ওষুধের দামের ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।

সামগ্রিক সমস্যার সমাধানের রাস্তা

যেহেতু আমাদের সমাজ ক্রমেই কেবল আর্থিক লাভটুকুই দেখছে, সেখানে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী ওষুধকোম্পানি সবাই নীতি মেনে চলবেন এমন আশা না করাই ভালো। অন্যদিকে, ভারত সরকার যদি কার্যকর ও যথাযথ ওষুধনীতি প্রণয়ন করেন ও তা মানতে বাধ্য করেন তাহলে ওষুধের দাম হাতের নাগালে আসতে পারে। আরও বেশি ওষুধ 'ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

আদেশ' (DPCO)-এর আওতায় আনতে হবে। জেনেরিক নামে ওষুধ তৈরি ও বিক্রি বেশি করার জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জেনেরিক ওষুধকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করছে: এটা এমন ফার্মাসিউটিক্যাল উৎপাদন যা—(১) কোনো আবিষ্কৃত দ্রব্যের বদলে ব্যবহার করা চলে, (২) আবিষ্কারকারী কোম্পানির কাছ থেকে অনুমতি নেবার দায় থেকে মুক্ত, (৩) পেটেন্ট জাতীয় একচেটিয়া স্বত্বাধিকার ফুরিয়ে যাবার পরে বাজারজাত করা হয়।

জেনেরিক ওষুধ আর মূল ওষুধে একই রাসায়নিক একই পরিমাণে থাকে, আর তাদের ডোজ ইত্যাদি একই হয়; জেনেরিক ওষুধের গুণমান নির্ধারণের জন্য 'ব্যাচ' ধরে পরীক্ষা করা হয় ঠিক মূল ওষুধের মতো করেই। আমেরিকায় জেনেরিক ওষুধ এফডিএ, অর্থাৎ ওখানকার ওষুধ নিয়ামক সংস্থার, কড়া তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত ও বাজারজাত হয়; এদেশেও সেটা না হবার কোনো কারণ নেই। তার ওপরে, যদি 'কেবল জেনেরিক' নীতি থাকে তাহলে যুক্তিসঙ্গত ও (ওষুধ মিশ্রণের বিপরীতে) এক -ওষুধ ফর্মুলেশন তৈরি ও বিক্রি হওয়া বাড়বে। দাম কমবে, আর নানা নামে একই ওষুধ ব্যবহার করা বন্ধ হলে অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রোগী বাঁচবেন; যেমন একই ওষুধ দু-জন চিকিৎসকের কাছ থেকে আলাদা নামে ব্যবস্থাপত্র হবার ফলে দ্বিগুণ ডোজে ওষুধ খাওয়া, বা কোনো ওষুধে অ্যালার্জি আছে জানা সত্ত্বেও নামের হেরফেরের ফলে সেই ওষুধ খাওয়া, বা এক চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র আরেকজনের বুঝতে না পারা, ইত্যাদি।

যদি 'কেবল জেনেরিক' নীতি থাকে তাহলে যুক্তিসঙ্গত ও (ওষুধ মিশ্রণের বিপরীতে) এক-ওষুধ ফর্মুলেশন তৈরি ও বিক্রি হওয়া বাড়বে। দাম কমবে, আর নানা নামে একই ওষুধ ব্যবহার করা বন্ধ হলে অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রোগী বাঁচবেন;

সিদ্ধান্ত

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ জেনে বা না জেনে এই সর্বব্যাপী সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, কেননা তাঁরা ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনৈতিক কাজের শরিক হয়ে পড়ছেন। বাণিজ্যিক বা ওই জাতীয় কোনো কারণ চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ানো ঠিক নয়, কেননা চিকিৎসকের কাছে রোগীর স্বার্থ প্রাথমিক। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তাঁদের ওষুধ সম্পর্কে অধুনাতন জ্ঞান অর্জনের জন্য কোম্পানির প্রতিনিধির ওপর ভরসা করবেন না। শেষত, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে ওষুধ প্রস্তুত- কারক ও বিতরণকারীদের সম্পর্ক একেবারে স্বচ্ছ হতে হবে।

ডাক্তারি শিক্ষা সারাজীবন চলে, তাই 'চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা চালু রাখা' (Continued Medical Education, সংক্ষেপে CME)-র ব্যবস্থা রাখতে হবে; বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, যেখানে নতুন জ্ঞান পাওয়া কঠিন। চিকিৎসকদের পেশাগত সংগঠনগুলোকে এই দায়িত্ব নিতে হবে, আর ওষুধ কোম্পানি ইত্যাদি স্পনসররা CME-র বিষয়, বক্তা, অথবা কী বলা হবে সে ব্যাপারে কোনো কথা বলতে পারবে না। স্পনসরশিপ তুলে দেওয়া শক্ত, কিন্তু সেটাকে প্রকাশ করতে হবে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কোম্পানির কাছ থেকে এমন কিছু নেবেন না যাতে তাঁরা কোম্পানির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েন। আর মানুষকেও ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। 'চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নীতিসঙ্গতভাবে চিকিৎসা করা আর সরকারিভাবে কঠিন হাতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ' এ দু-টো মানুষকে ওষুধ কোম্পানির অতি মুনাফা থেকে রক্ষা করবে।

লেখক পরিচিতি: ডা. কে কে প্রিয়াঙ্কা, বিডিএস ম্যাঙ্গালোরের একটি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে এমডিএস পাঠরত।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৫০ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বধিরতা

কানে শোনার সমস্যা বা বধিরতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ করা যায়, অন্য অনেক ক্ষেত্রে আংশিক বা পূর্ণ প্রতিকার সম্ভব। কিন্তু তার জন্য আপনাকেই সচেতন হতে হবে— লিখছেন **ডা. অসীমজীবন বসু।**

শুন শুন বন্ধুগণ শুন দিয়া মন।
'শুনিবার' কাহিনি আজি করিব বর্ণন।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান। মহাভারত দিয়েই শুরু করি। গর্ভবতী স্ত্রী সুভদ্রাকে অর্জুন গল্প শোনাচ্ছেন, যুদ্ধের গল্প। যুদ্ধে সেনা সাজানোকে বলা হত ব্যূহ রচনা, আর যে ব্যূহ ভেদ করা সবচেয়ে শক্ত ছিল সে ব্যূহের নাম চক্রব্যূহ। এই চক্রব্যূহ ভেদ করে সেখানে প্রবেশ করে যুদ্ধ করে, আবার চক্রব্যূহের বাইরে বেরিয়ে আসার কঠিন বিদ্যা, পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণ আর অর্জুন ছাড়া কেউ জানতেন না। সুভদ্রাকে অর্জুন চক্রব্যূহে প্রবেশ করার গল্প শোনাচ্ছেন, তারপর শোনাবেন চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার গল্প। কিন্তু গল্পের মাঝখানে সুভদ্রা পড়লেন ঘুমিয়ে; অর্জুনও গল্প বলায় ক্ষান্ত দিলেন। সুভদ্রার গর্ভের সন্তান জন্মালে তার নাম রাখা হল অভিমন্যু। অভিমন্যুর যখন বছর ষোলো বয়স, তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধল। একদিন কৌরব পক্ষের দ্রোণাচার্য যুদ্ধক্ষেত্রের একদিকে সাজালেন চক্রব্যূহ, অন্যদিকে প্রাগজ্যোতিষপুরের কৌরবপক্ষীয় রাজা ভগদত্ত কৃষ্ণার্জুনকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখলেন। প্রায়-বালক অভিমন্যু বললেন, আমি তো চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে জানি, মায়ের গর্ভে থাকার সময়েই শিখে নিয়েছি! অবশ্য বেরোতে জানি না। তার পরের গল্প আমাদের সবার জানা।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান কী বলছে? বলছে, মায়ের গর্ভে যখন শিশু মাত্র চার মাস বয়সের, তখনই শোনার জন্য যে শ্রবণেন্দ্রিয়, তার ভেতরের গঠন মোটের ওপর সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তাই গর্ভাবস্থায় মায়ের সামনে যদি মিষ্টি সুর শোনানো হয়, পেটের শিশু বা ভ্রূণের ভালো শারীরিক 'প্রতিক্রিয়া' হয়; অন্য দিকে হৈচৈ হট্টগোলে তার খারাপ 'প্রতিক্রিয়া' হয়। অবশ্য মায়ের পেট থেকে বিদ্যার্জন হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। বহিঃকর্ণ বা বাইরে দেখা যায় যে কান, তার গভীরে মধ্যকর্ণ, আর আরও ভেতরে অন্তঃকর্ণ, এই সব মিলিয়ে হল শ্রবণেন্দ্রিয়। এগুলোর মধ্যে অন্তঃকর্ণ গর্ভাবস্থার চার মাস বয়সেই পূর্ণবয়স্কদের মাপে তৈরি হয়ে যায় (''The inner ear has reached its full adult size and form by the end of fourth fetal month.'')। কিন্তু ধ্বনি থেকে শব্দ বোঝা, আর সেই শব্দ থেকে শব্দার্থ আহরণ করা— এটা অনেক পরের ব্যাপার। জন্মের পরে সামাজিক ক্রিয়ার অভিঘাতে শিশু ভাষা শেখে, তাই মায়ের পেটের মধ্যে তার অন্তঃকর্ণে ধ্বনি প্রবেশ করে বটে, কিন্তু ''কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

তবে আজকে আমার লেখা কানে শোনা-না-শোনা নিয়ে। আমি ধরেই নিচ্ছি কানে যা শোনা যাবে, সেটা বোঝার জন্য একটা সক্রিয় ও যথাযথ মস্তিষ্ক আছে।

বধিরতা কী, কেন, কাদের?

অভিধানে 'বধির' শব্দের অর্থ হল 'কালা', 'কানে না শোনা'। তবে আমরা 'বধির' কথাটা সাধারণত একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করি। কানে একেবারে না শুনলে আমরা তাঁকে বলি 'সম্পূর্ণ বধির', তবে এটা খুব কম সংখ্যায় দেখা যায়। যিনি কম শুনতে পান, একেবারে ঠিকঠাক শুনতে পান না, তাঁকেও আমরা 'বধির' বলব, এঁদেরই আমরা বেশি দেখতে পাই। কিংবা কখনো কখনো এক কানের বধিরতা আবার অন্য কানের শ্রবণ ক্ষমতা দিয়ে ঢাকা পড়ে যায়।

আজকের বিজ্ঞান বলছে, শ্রবণেন্দ্রিয় বা শোনার জন্য দেহযন্ত্রের মূল অংশটা মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই তৈরি হয়ে যায়। সুতরাং বধিরতার শুরু সেই সময় থেকেই হতে পারে। কিছু কিছু রোগ, কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গর্ভাবস্থায় শিশুকে (বা বলা উচিত, ভ্রূণকে) বধিরতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। আবার শিশুর জন্মের সময় প্রসবকালীন সঙ্কটও বধিরতার কারণ হতে পারে। বংশগত কিছু রোগ মা-বাবার কাছ থেকে শিশু পেতে পারে, তবে সে রোগের পূর্ণাঙ্গ রূপটা হয়তো ধরা পড়ে বেশি বয়সে। এ ছাড়া শৈশবে কিছু কিছু সংক্রামক ব্যাধি শ্রবণশক্তির বিপদ ডেকে আনতে পারে। বাচ্চাদের সর্দিকাশি খুবই হয়, তা থেকেও কানে শোনার ক্ষতি হতে পারে। বাচ্চা কানে কম শুনছে এমন সন্দেহ হলে বাবা-মাকে তৎপর হতে হবে, কেননা বাচ্চা তো জানেই না তার কতটা শোনা স্বাভাবিক আর কতটা অস্বাভাবিক।

বয়স্ক মানুষের বধিরতার সমস্যা খুব বেশি, কেননা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণশক্তি হ্রাস এক স্বাভাবিক ঘটনা। আমাদের গড় আয়ু বেড়ে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বার্ধক্যজনিত রোগ। বার্ধক্যজনিত বধিরতা এখন ঘরে ঘরে এক জ্বলন্ত বাস্তব। এর সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য রোগ পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। এঁদের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যরা বিরক্তিবোধ করেন, তৈরি হয় পারিবারিক অশান্তি। তাই প্রবীণদের শ্রবণশক্তির ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করা দরকার।

শিশু ও বৃদ্ধদের বাদ দিয়ে রইল যে তরুণ ও মাঝবয়সীরা, তাঁরাও কানের সংক্রমণ ও অন্যান্য প্রদাহে ভুগে শ্রবণশক্তি হারাতে পারেন। কানের পর্দা ফুটো হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রচুর ঘটে।

এ প্রসঙ্গে ছোটো করে বলি, বধিরতার 'ভান' ব্যাপারটা একেবারে ফেলনা নয়। বাচ্চা যখন খেলছে বা টিভি দেখছে তখন 'ওরে পড়তে বোস' বললে সে শুনতে পায় না (ছোটোবেলায় আমরাও পেতাম না, কী বলেন?) অর্থাৎ ওই যে বলেছি, কানে শুনলেই হবে না, মরমে পশিতে হবে, তবেই হবে পুরো 'শোনা'।

পরিবেশ: বধিরতার পেছনে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। প্রথমে 'সকল কাজের পাজি' বিভিন্ন ধরনের দূষণের কথাই বলা যাক।

জলদূষণ: গ্রামে খাল, বিল, পুকুর, কুয়ো, টিউবওয়েল; শহরে ট্যাঙ্কে জমে থাকা (হয়তো বা কাক মরে পচে থাকা) জল, সুইমিং পুলের জল, ভূগর্ভের জল (অগভীর, যাতে ভূতলের ওপরকার ময়লা ও জীবাণু চুঁইয়ে এসে মিশেছে), কলের অপরিষ্কার মুখ, এমনকী, সাহেবি কেতার শাওয়ারের মুখে জমে থাকা ময়লা। স্নানের জলের মাধ্যমে এরা সবাই সমস্যা করতে পারে; মূলত জীবাণুর উৎস হিসাবে, আর গৌণত জলে মিশে থাকা নানা ক্ষতিকর রাসায়নিকের দ্বারা।

শব্দ দূষণ: কলকারখানা, যানবাহন, হর্ন, বাস, ট্রেন, গাড়ি, জলযান, আকাশযান — কোথাও শব্দ দূষণের হাত থেকে মুক্তি নেই। যে সব মানুষ এই সমস্ত জায়গায় কাজ করেন, তাঁদের একটা বড় অংশ শব্দদূষণ-জনিত বধিরতার শিকার হন; সাধারণ মানুষও নিস্তার পান না। তার ওপরে রয়েছে আনন্দ-উৎসবের নামে বাজি পটকা ফাটানো। আর তেমন জায়গায় থাকলে একটু বড়ো 'বাজি', মানে বোমাগুলির শব্দও আছে। কোথাও আবার গুলি ছোড়া প্র্যাকটিস করা হয়। এরকম ক্ষেত্রে কানে তুলো গোঁজার মতো করে ইয়ার প্লাগ গুঁজলে কিঞ্চিৎ সুবিধা হতে পারে; কিন্তু সেটা করতে গিয়ে গাড়ির আওয়াজ শুনতে না পেয়ে চাপা পড়বেন না যেন! এটা কোনও অলীক কথা নয়, কানে মোবাইল গুঁজে কথা বলতে বলতে পথ চলা মানুষ বাসে ট্রেনে চাপা পড়ছেন, এমন খবর আকচারই পাওয়া যায়। এও এক মানস বধিরতা, তবে এ নিয়ে লিখব অন্য কোনো দিন।

রাসায়নিক দূষণ: কল-কারখানার বর্জ্য তরল ও গ্যাসীয় কেমিক্যাল, রং, অন্যান্য পদার্থ কানের ক্ষতি করতে পারে। এই সব কারখানার শ্রমিকদের এই সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি হয়।

জলে ও অন্তরীক্ষে কানের ওপর চাপ: আর একটা কারণ — সাধারণত সাময়িক বধিরতার সৃষ্টি করে। এরোপ্লেনে করে যখন উঁচুতে উঠি বা নীচুতে নামি, তখন বায়ু চাপের হ্রাস বৃদ্ধির কারণে কানে একটু অস্বস্তি হয় এবং শুনতে অসুবিধা হয়। কান আর গলার সংযোগকারী একটা নালী আছে, তার নাম ইউস্টেচিয়ান টিউব। সেটা সর্দিকাশি বা অন্য কারণে বন্ধ থাকলে বায়ু চাপের এই হ্রাসবৃদ্ধির ফলে অসুবিধা বেশি হয়। বারংবার এরকম হতে থাকলে শ্রবণের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। তাই কানে অস্বস্তি হলে বিমানযাত্রীদের উচিত নাক-মুখ বন্ধ করে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দেওয়ার চেষ্টা করা, ফুঁয়ে হাওয়া বেরোবে না কিন্তু। এতে গলার ভেতরে বায়ুচাপ বাড়ার ফলে বন্ধ ইউস্টেচিয়ান টিউব খুলে গেলে বাইরের বায়ুচাপ মধ্যকর্ণের বায়ুচাপের সঙ্গে সমান হয় ও কানে না শোনা, অস্বস্তি ও ক্ষতির সম্ভাবনা কমে। চুয়িংগাম চিবোলেও একই উপকার হতে পারে।

গীতিকার বা কবি বলেই খালাস, ''গভীরে যাও, আরও গভীরে যাও'', কিন্তু তিনি কি জানেন জলের তলায় কানের পর্দার ওপর চাপ বাড়ে; যত গভীর জলে যাওয়া যায়, এই চাপ তত বাড়ে। ফলে কানের পর্দার ক্ষতি হতে পারে। ডুব সাঁতার দিলে এটা হতে পারে; মৎস্যজীবীদের মধ্যে এই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রোগব্যাধি ও বধিরতা: রোগের সঙ্গে যোগ করতে হবে অচিকিৎসা ও কুচিকিৎসা-এ দুয়ের সম্মিলিত অবদান। সাধারণ সর্দিকাশি ও বেশ কিছু সংক্রামক রোগ কান ও গলার সংযোগকারী নালী ইউস্টেচিয়ান টিউব দিয়ে কানের ভেতরের একটা অংশকে (মধ্যকর্ণ) আক্রমণ করে বধিরতার সৃষ্টি করতে পারে। যে সব উপসর্গ দেখলে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার, তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হল কান দিয়ে পুঁজ পড়া। এছাড়া কানের ভেতর ব্যথা ও চুলকানি, কান ভোঁ-ভোঁ করা, কানে অতিরিক্ত 'খোল' বা চ্যাটচেটে পদার্থ দেখলেও সতর্ক হওয়া দরকার।

বেশ কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বধিরতা হতে পারে, যেমন টিবি রোগের ওষুধ স্ট্রেপ্টোমাইসিন। এগুলো ব্যবহার করার সময় চিকিৎসককে সতর্ক থাকতে হবে।

কিছু কিছু বিরল টিউমার থেকে বধিরতা হতে পারে; তবে সে সব ক্ষেত্রে সাধারণত বধিরতা ছাড়া অন্য উপসর্গও থাকে।

কর্তব্য কী?

এতক্ষণ যা লিখলাম তা থেকে কয়েকটা কথা তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে— যেমন নোংরা জলে ডুবে স্নান করবেন না। এই কথাগুলো আবার বলে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করছি। কিন্তু কিছু বদভ্যাস নিয়ে সতর্ক করার আছে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কী করবেন সেটা বলার আছে।

বদভ্যাস: কানে তেল দেবেন না, কানে জল ঢুকিয়ে পরিষ্কার করবেন না, কাঠি দিয়ে কান খোঁচাবেন না, কানের ওপর আঘাত এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে শিশু আর নারীদের কানে আঘাত (মাস্টারমশাই বা বাবা-মা শিশুকে চড় মেরে কানের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন এমন উদাহরণ অজস্র)। ধূমপান ও মদ্যপান সরাসরি ক্ষতি সাধারণত করে না, কিন্তু এদের জন্য শ্রবণশক্তির অপ্রত্যক্ষ ক্ষতি হয়, যেমন ধূমপায়ীদের গলার সংক্রমণ হয় বেশি আর তা কানে ছড়িয়ে পড়তে পারে— বর্জন করুন এইসব।

গর্ভাবস্থায় মায়ের যত্ন: তার মানেই গর্ভস্থ শিশুর যত্ন। প্রসূতি মা-কে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাওয়াবেন না, এবং চিকিৎসককে জানাবেন যে রোগিণী গর্ভবতী। গর্ভবতী নারীর কোনো রোগ হলে দ্রুত চিকিৎসা করুন, আপাতদৃষ্টিতে সামান্য রোগও গর্ভের শিশুর কানের ক্ষতি করতে পারে।

শিশুর জন্মের পর খেয়াল রাখুন: সে যেন কেবল মাতৃদুগ্ধই খায়। আর সে যে দুধই খাক না কেন, শিশুকে পুরো শুইয়ে দুধ খাওয়ানো উচিত নয়, মাথাটা যেন কিছুটা উঁচুতে থাকে। দেখুন শিশু শব্দ শুনতে পাচ্ছে কি না। সামনে থেকে শব্দ করে শিশুর বধিরতা বোঝা মুশকিল হতে পারে, কেননা, বাচ্চা ঠোঁটের নাড়াচড়া, চোখের ও হাতের ইঙ্গিত বুঝে সাড়া দেয়। সুতরাং শিশুর পেছন থেকে বা পাশ থেকে একটু জোরে শব্দ করে দেখুন সে চমকে উঠছে কি না বা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে কি না। শৈশবে বধিরতা থাকলে ভাষা শেখার সমস্যা হতে পারে। ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে নজর না দিলে, বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করলে, ভবিষ্যতে অসুবিধা অনিবার্য।

শিশুর নিয়মিত টিকাকরণ ও দ্রুত চিকিৎসা: যথাযথ টিকাকরণ না করলে যে সব রোগ হতে পারে সেগুলোর কয়েকটা থেকে বধিরতা হতে পারে। আর নানা রোগ, বিশেষ করে সর্দি-কাশি ও কানে পুঁজ-ব্যথা ইত্যাদির দ্রুত চিকিৎসা না হলে বধিরতা হওয়া সম্ভব।

বয়স্ক মানুষদের জন্য: তাঁদের রোগটা হয়তো সারবে না বা পুরো সারবে না, তার জন্য কিছু অসুবিধা হবেই, কিন্তু সেটা অনেকটাই কমানো যায়। কানের কাছে মুখ নিয়ে থেমে থেমে ধীর লয়ে, কিছুটা উঁচু গলায় কথা বলুন এঁদের সঙ্গে; দ্রুত চেঁচিয়ে পাঁচালি পড়ার মতো করে বললে চলবে না। বয়স হলেই শুনতে পাবেন না, এটা ধরে নেবেন না। চিকিৎসক বধিরতার কারণ যাচাই করে, দরকারে নানা পরীক্ষা করে, দেখে তবেই বলতে পারবেন কী হয়েছে, আর তার প্রতিকার কতটা কাজের হতে পারে। ওষুধপত্র, শল্যচিকিৎসা, শ্রবণযন্ত্র— যে কোনোটাই একটা বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। সারা জীবন শ্রবণ-প্রতিবন্ধী হয়ে বাঁচতে হবে, এমন ক্ষেত্র কিন্তু খুব বেশি নয়।

সামাজিক লজ্জা ও কুণ্ঠা: এর কোনো কারণ নেই। কানে শুনতে কম পান বলে আপনি অন্যদের থেকে খারাপ বা ছোটো হয়ে গেলেন, এই অমূলক চিন্তা একেবারে ছেড়ে দেন। অনেকে স্রেফ কুণ্ঠা থেকে, আরও অনেকে ঔদাসীন্য থেকে, শ্রবণ-প্রতিবন্ধী হয়ে জীবন কাটান। কিন্তু তাঁদের অনেকেই হয়তো একটু চেষ্টা করলে প্রায় স্বাভাবিক শ্রবণশক্তির অধিকারী হতে পারতেন।

শেষের কথা

আমাদের দেশে দৃষ্টিহীনরা খানিকটা সহানুভূতি পান, পরিবার ও সমাজ তাঁদের অসুবিধাগুলো কিছুটা হলেও বোঝে। বধির মানুষদের ক্ষেত্রে এই বোঝার চেষ্টাটাই যেন প্রায় অনুপস্থিত, এঁদের জোটে বিরক্তি, অবহেলা, বড়োজোর করুণা। অথচ বেটোফেন ছিলেন বধির, আর তিনিই হলেন পাশ্চাত্য সংগীতের সবচেয়ে বড় দিকপাল শিল্পী। করুণা বা দয়া নয়, এঁদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলে আমরা 'অ-বধির'-রা মানুষ হিসাবে নিজেদের মর্যাদাই বাড়াব।

লেখক পরিচিতি: ডা. অসীমজীবন বসু, এমবিবিএস, ডিএলও, এমএস, একটা সরকারি হাসপাতালে নাক-কান-গলা বিভাগের চিকিৎসক

With Best compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029

Phone : 033 2486-7885 / 8087

Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করবেন কেন ও কীভাবে?

কোলেস্টেরল শব্দের সঙ্গে আমাদের অনেকের পরিচিতি আছে। কষা মাংসই বলুন আর দেশি মুরগির ডিমের কুসুমই বলুন জিভে জল আসা খাবারদাবারগুলো খেতে গেলেই ডাক্তার বদ্যি, কত্তা-গিন্নি, মায় নিজের বিবেকও রক্তচক্ষু করে খাবার মজাটাই নষ্ট করে দেয়। কী, না কোলেস্টেরল আছে। উঠছে নিষ্পাপ প্রশ্ন, কী এই কোলেস্টেরল? খাদ্যে কোলেস্টেরল থাকলে কী ক্ষতি? কোলেস্টেরল-মুক্ত খাবার কীভাবে বাছবেন? উত্তর দিচ্ছেন — **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**।

কোলেস্টেরল এত গুরুত্বপূর্ণ কেন

ইদানিংকালে আমরা শুনছি, সারা বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু কম বেশি ২০ বছর করে বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আমরা অনেক উন্নত মানের জীবনও উপভোগ করছি। এই বর্ধিত আর উন্নত মানের আয়ু আংশিকভাবে সম্ভব হয়েছে ১৯৮৫ সালে চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক মাইকেল ব্রাউন ও জোসেফ গোল্ডস্টেইন-এর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য। দু-জন শিশু, এক জনের বয়স ৬ বছর আর এক জনের বয়স ৮ বছর। এরা হৃদরোগে আক্রান্ত (heart attack, myocardial infarction) হয়েছিল। সেই সময়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার জানা কোনো কারণ ওই শিশুদের শরীরে পাওয়া যায়নি। হৃদরোগে কোলেস্টেরলের ভূমিকা তখনও অপ্রমাণিত। এই দুই নিষ্পাপ হতভাগ্য শিশুদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ৫০০ মিলিগ্রাম (প্রতি ডেসিলিটারে) পাওয়া গিয়েছিল, যেটা স্বাভাবিকের চেয়ে আড়াইগুণ বেশি। এই আবিষ্কারের জন্য এঁরা যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পেলেন। তখন মনে করা হয়েছিল, জন্মগত ও জেনেটিক কারণই এত অস্বাস্থ্যকর উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলের জন্য দায়ী। জন্মগত ও জেনেটিক কারণ নয়, অস্বাস্থ্যকর জীবনশৈলীই ইদানিংকালের অস্বাস্থ্যকর উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলের মুখ্য কারণ সেটা জানা গেল পরে। সঠিক শয়তানের চিহ্নিতকরণের কৃতিত্ব ''মিস্টার কোলেস্টেরল'' নামে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অ্যানসেল ও জেরেমিয়া স্টিমলার-এর। এখন আমরা এটাও জানি, উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভোগা মানুষের ক্ষেত্রে শতকরা ৯০ শতাংশই অস্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী এর জন্য দায়ী। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মাত্রার হৃদরোগের প্রকোপের অধিকাংশই ওই সব দেশের নাগরিকদের রক্তের গড় কোলেস্টেরলের মাত্রা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

কোলেস্টেরল বস্তুটা আসলে কী

আমাদের খাবারের তেল বা স্নেহজাতীয় খাদ্যাংশ পৌষ্টিক তন্ত্র থেকে রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে যথাস্থানে অর্থাৎ প্রথমে যকৃৎ (লিভার) ও পরে চামড়ার নীচে, পেটের মধ্যে ও মাংসপেশির চারধারে পৌঁছে যায়, সংরক্ষণের জন্য। অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাবার, যা কিনা উদ্বৃত্ত অর্থাৎ দু-টো ভোজন প্রক্রিয়ার মধ্যেকার সময়ে খরচ করা যাচ্ছে না, সেটাও যকৃতে (গ্লাইকোজেন হিসাবে) সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতার উর্ধ্বে হয়ে গেলে স্নেহজাতীয় পদার্থে পরিণত হয় ও পরে ওই একই প্রক্রিয়ায় ফ্যাট সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সংরক্ষিত স্নেহজাতীয় পদার্থে পরিণত হয় ও পরে ওই একই প্রক্রিয়ায় ফ্যাট সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সংরক্ষিত স্নেহজাতীয় পদার্থ পরে দেহকোষের পুনর্নির্মাণের কাজে আর বিভিন্ন উৎসেচক ও হরমোন তৈরিতে কাজে লাগে। তবে এই প্রয়োজনের অনেক গুণ বেশি ফ্যাট মজুত হতে থাকে, যার একমাত্র ব্যবহার হতে পারে যদি অনেকক্ষণ অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয় আর যদি শরীরে অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। ইদানিংকালে সেই প্রয়োজন হওয়ার একরকম সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আমরা জানি, রক্ত একটা দ্রবণ (aquous solution), যাতে জলে দ্রবীভূত হয় এমন পদার্থই মিশতে পারে। তেলে জলে তো আর মিশবে না। খাবারের তেল জাতীয় অংশের সঙ্গে এক ধরনের প্রোটিন যুক্ত হয়ে লাইপোপ্রোটিন নামে যে যুক্ত অণুটি তৈরি হয় সেটি জলে দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এক্ষেত্রে প্রোটিন অণুটা তেলের অণুর বাহকের কাজ করে, অনেকটা ট্যাক্সির মতো। গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে প্রোটিন অণুটি পুনর্ব্যবহারের জন্য তেলের অণু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তেল (লিপিড) ও প্রোটিনের সংমিশ্রণে তৈরি বলে এর নাম লাইপোপ্রোটিন। এটাই কোলেস্টেরল। প্রোটিনের ঘাড়ে চেপে রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হওয়া কোলেস্টেরল বা লাইপোপ্রোটিন তার ঘনত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উৎস, নাম ও রাসায়নিক গঠন এক হলেও ঘনত্বের ও তৎসম্পর্কিত ভৌত অবস্থার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কোলেস্টেরলের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া বিভিন্ন হয়।

ধমনিগাত্রে জমা কোলেস্টেরল

ধমনিতে কোলেস্টেরলের আস্তরণ

প্রতিটি মানব কোষের যে বাইরের আবরণ তার একটি অপরিহার্য পদার্থ কোলেস্টেরল। এছাড়াও বহু শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার (যেমন অন্ত্রে খাবার হজমের জন্য যকৃতে উৎপন্ন ''বাইল অ্যাসিড'') ও হরমোনের (শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার জন্য

রাসায়নিক প্রয়োজনীয় সংকেত বহনকারী পদার্থ) নিরবচ্ছিন্ন নবীকরণের জন্যও কোলেস্টেরলের দরকার। সমস্যা হল রক্তে এর মাত্রা বেশি হয়ে গেলে। কোলেস্টেরলের লঘুঘনত্বের অংশটি (LDL cholesterol) রোগ সৃষ্টি করার জন্য কুখ্যাত। শিশুর জন্মের সময় লঘু ঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা থাকে ৩০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। অস্বাস্থ্যকর খাবার ও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সচেতনভাবে ও অবচেতনে উপযুক্ত শারীরিক শ্রমের অভাবে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে থাকে। অজস্র কারণে রক্তনালীর মধ্যেকার আবরণের ক্ষত সৃষ্টি হতে থাকে, ঠিক যেমন করে আমাদের মুখে ও জিভে ঘা হয়। মুখের ঘা এমনি এমনি মিলিয়ে গেলেও রক্তনালীর মধ্যের ঘা রক্তের মধ্যে ভেসে বেড়ানো রক্তের এক কণিকা ''অণুচক্রিকা'' (platelet)-কে আকর্ষিত করে। আকর্ষিত ও উত্তেজিত অণুচক্রিকা, রক্ত জমাট বাঁধার ''ফিব্রিন'' (fibrin) আর লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল একসঙ্গে মিশে রক্তনালীর মধ্যের ক্ষতে জমতে থাকে। প্রথমে কোলেস্টেরল-যুক্ত জমাট বাঁধা রক্তের উপাদান নরম থাকলেও ক্রমশ সেটা শক্ত হতে থাকে ও রক্তনালীর ভেতরের গায়ে সেটা পাকাপাকিভাবে যুক্ত হয়ে রক্তনালীর আবরণকে মোটা করে দেয়। ফলে রক্তনালীর মধ্যেকার রক্ত চলার পথটি সরু হয়ে যায়। এই পরিবর্তনটা একইসঙ্গে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের রক্তনালীতে ঘটতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক, বৃক্ক, চোখ, ক্ষুদ্রান্ত্র ও পায়ের রক্তনালীতে হলে ওইসব অঙ্গগুলোর স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের যেমন রক্তনালীতে জমে যাবার প্রবণতা আছে, গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের ক্রিয়া তেমনই বিপরীত। গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল সাফাইওয়ালার মতো কাজ করে; রক্তনালীতে সদ্য জমে যাওয়া লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলকে সাফসুতরো করে। রক্তনালীকে পরিষ্কার করে। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, বৃক্ক ইত্যাদি অঙ্গের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের অর্থাৎ খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কম রাখা আর গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল অর্থাৎ ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা যথাসম্ভব বেশি রাখা।

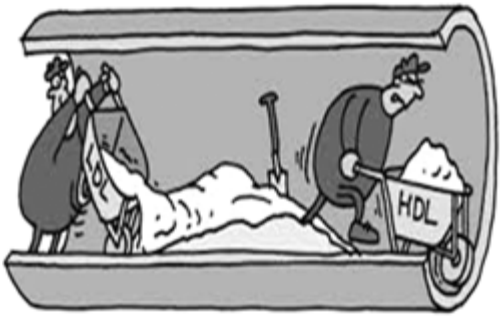

ঘনত্ব অনুযায়ী কোলেস্টেরলকে প্রাথমিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: (১) বেশি বা গুরুঘনত্বের (high density, HDL), (২) কম বা লঘুঘনত্বের (low density, LDL, এই খলনায়কই মোট কোলেস্টেরলের ৬০ শতাংশ) (৩) খুব কম বা অতি লঘুঘনত্বের (very low density, VLDL) লাইপোপ্রোটিন বা কোলেস্টেরল। রক্তে প্রবহমান ট্রাইগ্লিসারাইড নামে অবশিষ্ট আর এক স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে। ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা কোলেস্টেরলের চেয়ে কম। ট্রাইগ্লিসারাইডের আলোচনা অন্য সময়ের জন্য মুলতুবি থাক। রোগভোগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এর মাত্রা স্বাস্থ্যকর সীমার বেশি হয়ে গেলে হৃদরোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক ইত্যাদি রোগের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। রক্তে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরলকে চিকিৎসা-পরিভাষায় ডিস্‌লিপিডিমিয়া (dyslipidaemia) বলে উল্লেখ করা হয় এটা বোঝানোর জন্য যে, লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল বেড়ে গেছে আর গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল কমে গেছে। ডিস্ (dys) এই শব্দাংশের অর্থ সীমার বাইরে, লিপিড (lipid) কোলেস্টেরলের অপর নাম আর ইমিয়া (aemia or emia) শব্দাংশের অর্থ অস্বাভাবিকতাটা রক্তে।

কোলেস্টেরলের স্বাস্থ্যকর সীমা ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে ও জাতিভেদে ভিন্ন হয়। জেনেটিক কারণ, খাদ্যাভ্যাস ও সেই জাতির শারীরিক শ্রমের অভ্যাসের ফারাকের জন্য বিশেষ করে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের হৃদরোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ভিন্ন হয়। দক্ষিণ ইউরোপের এক জন মানুষের রক্তে প্রতি ডেসিলিটারে ৩২০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা উত্তর ইউরোপের মানুষের ২৪০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটারে কোলেস্টেরলের রোগ সম্ভাবনার সমতুল্য। আমেরিকাবাসীদের কোলেস্টেরলের মাত্রা ৩২০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার হলে হৃদরোগ সম্ভাবনার তুলনায় ভারতীয়দের কোলেস্টেরলের মাত্রা ২৪০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার হলে সেই সম্ভাবনা বেশি। অপর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যদিও সাদা চামড়াওয়ালা মানুষদের চেয়ে ভারতীয়দের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, রক্তে সম পরিমাণ কোলেস্টেরলের মাত্রার জন্য ভারতীয়দের হৃদরোগ সম্ভাবনা (সাদা চামড়াওয়ালা মানুষদের চেয়ে) প্রায় দ্বিগুণ। বিগত ত্রিশ দশকে শহরবাসী ভারতীয়দের কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়েছে প্রায় ৩০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার (১৭০ থেকে ২০০), যে সময় আমেরিকাবাসীদের কোলেস্টেরলের মাত্রা ওই একই পরিমাণে কমেছে (২৩০ থেকে ২০০)। অর্থাৎ এখন আমাদের কোলেস্টেরলের মাত্রা আমেরিকাবাসীদের সমান হলেও পৃথক কোলেস্টেরলের ধরনের আর আনুষঙ্গিক হৃদরোগের উপাদানের জন্য আমেরিকাবাসীদের থেকে আমাদের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের দেশের মধ্যেও কেরালায় কোলেস্টেরলের মাত্রা সর্বাধিক (গড়ে ২৩০), যেটা রান্নায় নারকেল তেলের ব্যবহারের জন্য মনে করা হয়।

কোলেস্টেরলের পরীক্ষার ফল কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

পরীক্ষাগার থেকে পাওয়া কোলেস্টেরলের পরীক্ষার ফলাফলের অনেকগুলো অংশ থাকে। পরিভাষায় সামগ্রিকভাবে একে ''লিপিড প্রোফাইল'' বা ''লিপিড প্যানেল'' বলে উল্লেখ করা হয়। এর প্রধান দু-টো অংশ (১) টোটাল বা মোট কোলেস্টেরল আর (২) ট্রাইগ্লিসারাইড। মোট কোলেস্টেরলের বিশ্লেষণ করে ঘনত্ব অনুযায়ী তিন ধরনের অংশ বা লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা মেপে রিপোর্টে উল্লেখ করা থাকে। এর মধ্যে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল (Low Density Lipoprotein, LDL cholesterol) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলই চিকিৎসার নিশানা হওয়া উচিত। কোলেস্টেরলের দ্বিতীয় অংশটি হল গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল (High Density Lipoprotein, HDL cholesterol)। তৃতীয় বা শেষ অংশটি অতি লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল (Very Low Density Lipoprotein,VLDL cholesterol) এবং এটি চিকিৎসার সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো ভূমিকা পালন করে না। পড়ে রইল ট্রাইগ্লিসারাইড। যদিও এটা

বেশি থাকাটা হৃৎপিণ্ড ছাড়াও অন্যান্য রোগ সম্ভাবনা বাড়ায়, এটা কমানোর ওষুধও পাওয়া যায়, ইদানিংকালে ওষুধ ব্যবহার করে ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর সুফল অপ্রমাণিত। রক্তে উচ্চ মাত্রার ট্রাইগ্লিসারাইড ভারতীয়দের সমস্যা, পশ্চিমী দুনিয়ায় এটার প্রাদুর্ভাব নেই। সেই কারণে এর চিকিৎসা অনুসন্ধানও অবহেলিত। জিনের সমস্যা তো আছেই, ভারতীয়দের খাদ্যে শর্করা জাতীয় খাবারের আধিক্যে ও মিষ্টির অপব্যবহারে রক্তের গড়পড়তা ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা আকাশছোঁয়া। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ওষুধের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর চিকিৎসার সুফল তাই প্রমাণিত নয়। রক্তে সুগারের বা ইউরিয়ার মাত্রার সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকর উচ্চসীমা আছে। কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে তেমনটি নেই। ভৌগোলিক ক্ষেত্র ও জাতিভেদের জন্য ফারাক তো আছেই; একই জাতির মধ্যেও ব্যক্তিবিশেষের অন্যান্য শারীরিক রোগ নির্ণায়ক অবস্থা ভেদেও কোলেস্টেরলের স্বাস্থ্যকর উচ্চসীমা আলাদা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সম্পূর্ণ সুস্থ্য মানুষের লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের স্বাস্থ্যকর উচ্চসীমা ১৩০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার হলেও উচ্চ রক্তচাপে ভোগা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই মাত্রা ১০০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার আর হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা হবে মাত্র ৭০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল চিকিৎসার নির্দেশিকার এক আমূল পরিবর্তন প্রবর্তিত হয়েছে। বিতর্ক চলছে, কিন্তু যত বেশি করে কোলেস্টেরলের হৃদরোগ ঘটানোর রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে, ক্রমশ এর স্বাস্থ্যকর উচ্চসীমা নিম্নগামী হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, যদি কোনো হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা বর্তমানে চালু তথ্য অনুযায়ী স্বাভাবিকও থাকে, অভিজ্ঞ হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ সঙ্গত কারণেই কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ প্রয়োগ করেন। এই রকম আপাত জটিল মোট, লঘুঘনত্বের আর গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের বাঞ্ছনীয় মাত্রা কোলেস্টেরল পরীক্ষার ফলের সঙ্গে উল্লেখ করা থাকে।

কোলেস্টেরল ও মানবশরীর

কোলেস্টেরলের মাত্রার সঙ্গে হৃদরোগের সরাসরি ও আনুপাতিক (direct and graded) সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ কোলেস্টেরলের মাত্রা যত বেশি, হৃদরোগের সম্ভাবনা ও জটিলতা তত বেশি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই জ্ঞান প্রয়োগের জন্য স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের মধ্যে একটা সীমারেখা টানতেই হয়। কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রাকে প্রাথমিক নিশানা করতে হবে। মোট কোলেস্টেরল আর গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রাও হৃদরোগের সম্ভাবনা নির্ণয় করে, কিন্তু চিকিৎসার নিশানা হিসাবে সফল বলে প্রমাণিত নয়। উচ্চ মাত্রার ট্রাইগ্লিসারাইডের রোগ-সৃষ্টিকারী ক্ষমতার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড একান্তভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্যা, এটা নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ায় হেলদোল কম। ফেনোফাইব্রেট নামে একটা চালু ওষুধ আছে, যেটা ট্রাইগ্লিসারাইড উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারলেও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা অপ্রমাণিত। যেটুকু জানা গেছে, কোলেস্টেরল সম্পর্কিত রোগভোগের বোঝা কমানোর জন্য, সাবালক হওয়ার পরে (মতভেদ ২০ থেকে ৩০ বৎসর বয়স থেকে) প্রতি পাঁচ বছর পরে পরে মেপে দেখতে হবে মোট লঘুঘনত্বের, গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা। মোট কোলেস্টেরল, লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা যথাক্রমে সর্বাধিক ২০০, ১৩০, ১৫০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার থাকা আর গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা সর্বনিম্ন ৪০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার বাঞ্ছনীয়। হৃদরোগের অন্য উপাদান হিসাবে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি মজুত থাকলে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা ১০০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটারের নীচে থাকলে ভালো। হৃদরোগের লক্ষণ থাকলে এটা ৭০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটারের নীচে নামাতে হবে। রোগের লক্ষণ না থাকলেও কোলেস্টেরল, তার বিভিন্ন অংশ আর ট্রাইগ্লিসারাইড এই সীমার মধ্যে না থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। নতুন পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, হৃদরোগের সূত্রপাত হয়ে গেলে, কোলেস্টেরলের মাত্রার উপরে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ প্রয়োগ ও ওষুধের মাত্রা নির্ভর করে না। এমন অবস্থায় সর্বোচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরলের কমানোর ওষুধ প্রযুক্ত হয়। ৩০ শতাংশ আমেরিকাবাসী ও ৫০ শতাংশ ভারতীয় স্বাভাবিক মাত্রার কোলেস্টেরল থাকা সত্ত্বেও হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং সেইসব ক্ষেত্রে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ অন্য প্রক্রিয়ায় হৃদরোগের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে শ্লথ করে—আজ এটা প্রমাণিত।

এই অবসরে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বুঝে নিতে হবে। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকলে আর সেই কারণে ওষুধ গ্রহণ করা শুরু করলে দুই বা তিন মাসের মধ্যে কোলেস্টেরল কমে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়াই দস্তুর। ভুলেও ভাবা উচিত নয়, কোলেস্টেরল কমানোর নবতম ওষুধ (স্ট্যাটিন) উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরলের কারণকে মেরামত করে। এই ওষুধগুলো কেবল সাময়িকভাবে কৃত্রিম উপায়ে কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগের চিকিৎসার মতো উচ্চ কোলেস্টেরলের চিকিৎসা জীবনভর চালিয়ে যেতে হয়, কোলেস্টেরল কমে গেলেও। সাম্প্রতিকতম নির্দেশিকা অনুযায়ী (November 12, 2013, American College of Cardiology and American Heart Association) হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের কোলেস্টেরল স্বাভাবিক অথবা কম থাকলেও জীবনভর সর্বোচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ গ্রহণ করে যেতে হবে। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, যেহেতু হৃদরোগে আক্রান্ত হলে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রার উপর নির্ভর করে না, তা হলে এই রকম ক্ষেত্রে কোলেস্টেরল পরীক্ষা করার প্রয়োজন কী? ওষুধ তো খেতেই হবে। সম্ভব হলে ও সময় থাকলে (কারণ, কোনো কারণেও পরীক্ষা করার দেরির অজুহাতে ওষুধ প্রয়োগে দেরি হলে চলবে না) কোলেস্টেরলের ওষুধ শুরু করার এবং তিন মাস পরে, রক্তে (বিশেষ করে) লঘুঘনত্বের মাত্রা নির্ণয় করে নিতে হবে। ওষুধ শুরুর আগে রক্তে লঘুঘনত্বের মাত্রা স্বাভাবিক থাকলে ওষুধ শুরুর তিন মাস পরে সেটা কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কমলে তবেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কোলেস্টেরল ও তার বিভিন্ন ঘনত্বের অংশগুলোর উপলব্ধ পরীক্ষা এখনও যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেনি। বিভিন্ন ঘনত্বের কোলেস্টেরলের ও আবার তস্য শ্রেণিবিভাগ আছে, যেটার ব্যবহার এখনও গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ। সেই কারণেই এই জটিলতা।

যদিও শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার জন্য কোষের মধ্যে কেবল ২.৫ ও রক্তে যথাক্রমে ২৫ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল প্রয়োজন আর সারা বিশ্বের নবজাতকের রক্তে এর মাত্রা ৩০ থেকে ৪০ মিলিগ্রাম

/ ডেসিলিটারের নীচে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল মাত্রা বাড়তে থাকে। মনে করা হয়, মোটামুটি কুড়ি বৎসর বয়সের সময় থেকেই এই লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া (অক্সিডেশন) হতে থাকে, যার ফলে রক্তনালীতে কোলেস্টেরল অণুচক্রিকা ফিব্রিনের সংঘবদ্ধ আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতি হল সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালী আর সেটা অপরিবর্তনযোগ্য। ট্রাইগ্লিসারাইড নিজে সরাসরি রক্তনালীকে আক্রমণ করে না, উচ্চ মাত্রার লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের রাসায়নিক পরিবর্তন করে (আরও ক্ষুদ্র ও ঘন করে) এর ক্ষতি করার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। উচ্চ মাত্রার ট্রাইগ্লিসারাইড পরোক্ষভাবে আর একটা ক্ষতি করে। বেশিরভাগ পরীক্ষাগারে সরাসরি লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল মাপার বন্দোবস্ত থাকে না। সরাসরি মোট কোলেস্টেরল, গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড মেপে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল অঙ্ক কষে বের করা হয় [লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল LDL= মোট কোলেস্টেরল (Total Cholesterol)] – [অতি লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল (VLDL) + গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল (HDL)]। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অতি লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল নির্ণয় করা কঠিন বলে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রার এক-পঞ্চমাংশ অতি লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রার সমান বলে ধরে নেওয়া হয়। ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা ৫০০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার বেশি হলে এই সমীকরণ কাজে আসে না। এর অর্থ এই যে, ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা যত বেশি হবে, বাজারি পরীক্ষায় লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল মাত্রা তত ভুলভাবে কম বলে প্রতিফলিত হবে। ভারতীয়দের রক্তে উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেশি থাকার ফলে আমাদের বেশি যত্নবান হতে হবে। এই কারণে মোট কোলেস্টেরল থেকে কেবল গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাদ দিয়ে ''নন এইচ ডি এল কোলেস্টেরল'' বলে আর এক নির্ণায়ক স্থির করা হয়েছে, যেটা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা ৭০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার, নন এইচ ডি এল কোলেস্টেরল এর ১০০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার সমতুল্য। হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বিতীয় হৃদরোগের আক্রমণ এড়ানোর জন্য ''নন এইচ ডি এল কোলেস্টেরল'' এর সর্বাধিক মাত্রা ১০০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটারের নিশানা করে চিকিৎসা করা উচিত।

লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষার ফলে কোলেস্টেরলের বিভিন্ন অংশের অনুপাত উল্লেখ করা থাকে, যেগুলোতে গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল অনুপাতের ''হর'', ''numerator'' বা ভগ্নাংশের নীচের অংশে থাকে যেমন ''মোট / গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের অনুপাত, ট্রাইগ্লিসারাইড / গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের অনুপাত ইত্যাদি। অর্থাৎ গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল সরাসরিভাবে চিকিৎসার নিশানা না হলেও, রোগসম্ভাবনার ওইসব গুরুত্বপূর্ণ ''কোলেস্টেরলের বিভিন্ন অংশের অনুপাত (TC/HDL ratio)'' নির্ণায়কগুলিকে প্রভাবিত করে। মোট / গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের অনুপাতটি আলাদা করে যাদের মোট কোলেস্টেরল বেশি নয় কিন্তু গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল আশঙ্কাজনকভাবে কম তাদেরকে আলাদা করে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ মোট কোলেস্টেরল বেশি না হলেও TC/HDL অনুপাত বেশি হলে সেটা চিকিৎসাযোগ্য। মনে করা হয়, আমাদের দেশের মানুষের মোট কোলেস্টেরল সাধারণত খুব বেশি না হলেও (< ২৪০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার) TC/HDL অনুপাত ৩-এর কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই অনুপাত ৮-এর বেশি হলে হৃদরোগের সম্ভাবনা ৮ গুণ বৃদ্ধি পায়। সরাসরি লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের পরীক্ষা উৎকৃষ্ট কিন্তু ব্যয়বহুল। লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষার ফল (মোট ও গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড) থেকে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল নির্ণয় করার এক পরোক্ষ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। ট্রাইগ্লিসারাইড / গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের অনুপাত (TG/ HDL ratio)-কে গরিবের লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের পরীক্ষার ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই অনুপাতটি লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও ঘন যুক্ত কোলেস্টেরল অণুর (small & dense LDL particle)-কে চিহ্নিত করে। তিনের বেশি ট্রাইগ্লিসারাইড / গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের অনুপাত ক্ষুদ্র ও ঘন যুক্ত কোলেস্টেরল অণুর লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের অস্তিত্ব নির্ণয় করে। যেকোনো মাত্রার লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলে তিনের বেশি ''ট্রাইগ্লিসারাইড / গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের অনুপাত'' হৃদরোগের সম্ভাবনা তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়।

কোথা থেকে আসে এত কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরলের ভূতের ভয়ে অনেকে খাবারের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয়ভাবে খুঁতখুতে হয়ে পড়েন। সঠিক শত্রুকে চিনতে হবে। এটা ঠিক যে আমাদের বেশ কিছু খাবারে সরাসরিভাবে কোলেস্টেরল থাকে। জেনে রাখা যাক, ডিম, খাসির মাংস ইত্যাদি খাবারে কোলেস্টেরল থাকলেও খাবারের মাধ্যমে যতটা কোলেস্টেরল শরীরে ঢোকে তার তিন গুণ কোলেস্টেরল যকৃৎ তৈরি করে খাবারের সম্পৃক্ত ফ্যাট থেকে। বিজ্ঞাপনে যতই প্রচার করুক না কেন, কোলেস্টেরলমুক্ত বা অন্য যেকোনো তেলে ভাজা মাছ, আলু, লুচি বা যেকোনো ভাজা খাবার রক্তের কোলেস্টেরলের মুখ্য উৎস। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন খাদ্যে সম্পৃক্ত ফ্যাট ১০ শতাংশের কম রাখা (ক্যালোরির হিসাবে), যথাসম্ভব ট্রান্সফ্যাট বা ভাজা বর্জন করা আর মেদমুক্ত থাকা। দেখা গেছে, মোটা নয় এমন মানুষও যদি নিয়মিত এরোবিক ব্যায়াম (জোরে হাঁটা, দৌড়ানো, ট্রেডমিলে হাঁটা ইত্যাদি) করতে পারেন তবে বেশি মাত্রায় কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা

হিসেব কষে দেখা গেছে, স্বাস্থ্যকর খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে কোনো জনগোষ্ঠীর মাত্র ১০ শতাংশ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে পারলে ৩০ শতাংশ হৃদরোগ কমানো যায়। বিগত তিন দশকে আমেরিকায় কেবল খাদ্য সচেতনতা বৃদ্ধির দ্বারা ওই দেশের গড় কোলেস্টেরলের মাত্রা ২৩০ থেকে ২০০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটারে কমানোর মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ হৃদরোগ কমানো সম্ভব হয়েছে। কৈশোরেই উচ্চ অস্বাস্থ্যকর কোলেস্টেরলের ক্ষতিসাধন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রকাশ পায় মাঝবয়সে। সব বয়সে সম্পর্ক থাকলেও কোলেস্টেরলের সঙ্গে হৃদরোগের অশুভ আঁতাত ৪০ বৎসর বয়সে সর্বাধিক। অপরিণত বা ৫০ বছরের কম বয়সে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব প্রতি ৪০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ হয়ে যায়। স্বাস্থ্যকর কোলেস্টেরলের উচ্চসীমা দেশ বা জাতি ভেদে (race) ভিন্ন হয়। আমেরিকাবাসীদের ক্ষেত্রে কোলেস্টেরলের স্বাস্থ্যকর উর্ধ্বসীমা যেমন ১৬০ মিলিগ্রাম (প্রতি ডেসিলিটার রক্তে), চীনদেশীয়দের ক্ষেত্রে এটা ১২০

মিলিগ্রাম। জিনগত কারণে ভারতীয়দের হৃদরোগের সম্ভাবনা অধিক। কোনো প্রামাণ্য নথি না থাকায়, মনে করা হয়, এই উর্ধ্বসীমা আমেরিকাবাসীদের চেয়ে অন্তত ২০ শতাংশ কম থাকা বাঞ্ছনীয়।

কোলেস্টেরল কমাতে হবে এটা বোঝা গেলেও বোঝা গেল না, এটার প্রয়োজন বোঝা যাবে কী উপায়ে? এখানে একটা মুশকিল আছে। কোলেস্টেরলজনিত রোগ তো কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার বেশ কিছুটা পরে হয়। কিন্তু তখন কোলেস্টেরল কমিয়ে শারীরিক ক্ষতিটা সারানো যায় না, যেমনটা কাচের গ্লাস ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না। মানুষ আপন বুদ্ধিবলে শিখেছে, আগে থেকেই সাবধান হতে হবে। রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে প্রথমেই কোনো কষ্ট হবে না, উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরলের কারণে হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোক হতে দুই-তিন দশক লেগে যায়। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে ওই রোগ শুরু হওয়ার অনেক আগেই। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ মানুষের কোলেস্টেরল বেড়ে গেছে কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এটা কেবল রোগ সম্ভাবনা নির্ণয়ের জন্য নয়, কোলেস্টেরল বেশি এটা নির্ণীত হলে আর সেটা নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত করতে পারলে ওই মারণরোগগুলিকে নিবারণ করা সম্ভব হবে। আপাত সুস্থ মানুষের নিয়মিত কোলেস্টেরল নির্ণয় প্রক্রিয়া শুরু করার ও একটা সুনির্দিষ্ট সময় অন্তর সেটা পুনরায় নির্ণয় করে যাওয়ার বিধিসম্মত নির্দেশিকা আছে। আমেরিকার শিশু চিকিৎসকদের স্বীকৃত সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী ৮ বছর বয়স থেকে রক্তের কোলেস্টেরল নির্ণয়ের নিদান দেয়। আনুষঙ্গিক শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমাদের দেশে ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে প্রথমবার ও স্বাভাবিক থাকলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ক্রমান্বয়ে কোলেস্টেরলের মাত্রা নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে।

কোলেস্টেরল কীভাবে কমানো যায়?

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের তিনটে প্রক্রিয়া, যার সবকটিই একই সঙ্গে চালু করতে ও চালু রাখতে হবে। শুধু চালু রাখাটাই বড়ো কথা নয়, এই প্রক্রিয়াগুলো আজীবন চালিয়ে যেতে হবে। এগুলোকে ভালো লাগাতে হবে। দাঁত মাজা, স্নান করা ইত্যাদি অন্যান্য প্রতিদিনের কর্মসূচির মতো করে অভ্যাস করে নিতে হবে। প্রক্রিয়া তিনটে হল খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, দৈনিক শরীরচর্চা ও ওষুধ। খাবারে সরাসরি কোলেস্টেরল গ্রহণ কমালেই হবে না। রক্তের কোলেস্টেরলের মুখ্য উৎস খাবারের মেদবৃদ্ধির উপাদান,অর্থাৎ স্নেহজাতীয় খাবার ও শর্করাসমৃদ্ধ খাবার। স্বাস্থ্যকর খাবারের মূল সূত্রগুলি জটিল নয়। শরীরে মেদবৃদ্ধি ঠেকাতে, উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এমনকী রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর জন্য খাদ্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ফারাক নেই। ক্যালোরির মাপে, খাবারে শর্করার পরিমাণ ৫০ থেকে ৬০ শতাংশে সীমিত রাখতে হবে। সরল শর্করা অর্থাৎ চিনি যতটা সম্ভব বর্জন করতে হবে। ভাজা খাবার পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে হবে। সম্পৃক্ত ফ্যাট, যেমন ঘি, মাখন, মাংসের চর্বি থেকে পাওয়া ক্যালোরি ৭ থেকে ১০ শতাংশে সীমিত রাখতে হবে। শুধু খাবারের ওপরে রাশ টানলেই হবে না। ঘাম ঝরাতে হবে। দৈনিক এরোবিক ব্যায়াম, অর্থাৎ ক্ষমতা অনুযায়ী জোরে হাঁটা, দৌড়োনো, সাঁতার কাটা ইত্যাদি ধরনের ব্যায়াম করতে হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নির্দেশিকা অনুযায়ী রক্তে সুনির্দিষ্ট মাত্রার বেশি কোলেস্টেরল থাকলে ওষুধও খেয়ে যেতে হবে। কোলেস্টেরল কমানোর জন্য ''স্ট্যাটিন'' জাতীয় ওষুধ বিগত শতাব্দীর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এই সময়ে কোলেস্টেরল কমানোর জন্য স্ট্যাটিন শ্রেণির ওষুধই একমাত্র ব্যবহৃত হয়। অবশ্য স্ট্যাটিন শ্রেণির ওষুধের নতুন নতুন প্রজন্মের প্রবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে এটরভাস্ট্যাটিন, রোজুভাস্ট্যাটিন আমাদের দেশে সর্বাধিক চালু ওষুধ। এখানে ওষুধের গুণাগুণ আলোচনা করব না। কেবল মনে রাখি, কোনো ওষুধের কোলেস্টেরল কমানোর ক্ষমতা আর হৃদরোগের নিবারণের ক্ষমতা সমান্তরালভাবে চলে না। কোনো কোনো কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ কম শক্তিশালী হলেও হৃদরোগ নিবারণে বেশি কাজের হতে পারে, কেবল পরিমাণে বেশি গ্রহণ করতে হবে। কোলেস্টেরলের ওষুধ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তটা জটিল, চিকিৎসকের কাজ। আমাদের প্রয়োজন, সচেতন হওয়া। বিনা ওষুধের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া হিসেবে, স্বাস্থ্যকর খাবারে অভ্যস্ত হওয়া আর এরোবিক ব্যায়ারে জন্য কোলেস্টেরল পরীক্ষার বা চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। কোলেস্টেরলের ওষুধ খেলে ও আনুষঙ্গিক জীবনশৈলীতে অভ্যস্ত হলে কোলেস্টেরল কমে যাবে। সেটাই কাম্য, কিন্তু এই কমে যাওয়াটা সাময়িক। আগে কেউ কেউ মনে করতেন কোলেস্টেরল খুব কমে গেলে কিছু ক্ষতি হতে পারে। দীর্ঘ গবেষণা আর অভিজ্ঞতায় বৈজ্ঞানিকগণ বুঝতে পেরেছেন, কোলেস্টেরলের মাত্রা খুব কমে গেলে ক্যানসার অথবা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা অমূলক।

> কোনো ওষুধের কোলেস্টেরল কমানোর ক্ষমতা আর হৃদরোগের নিবারণের ক্ষমতা সমান্তরালভাবে চলে না। কোনো কোনো কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ কম শক্তিশালী হলেও হৃদরোগ নিবারণে বেশি কাজের হতে পারে, কেবল পরিমাণে বেশি গ্রহণ করতে হবে।

একনজরে:

১। খাবারের স্নেহজাতীয় (ফ্যাট বা লিপিড) পদার্থকে পৌষ্টিক নালী থেকে তার কর্মস্থলে পৌঁছোনোর জন্য রক্তের প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তরসে দ্রবীভূত হওয়ার প্রয়োজনে এক ধরনের প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। এই ফ্যাট ও প্রোটিনের যুক্ত অণুর আর এক নাম কোলেস্টেরল বা লাইপোপ্রোটিন।

২। ঘনত্ব অনুযায়ী কোলেস্টেরলের শ্রেণি বিভাগ আছে। সব শ্রেণির কোলেস্টেরলের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া এক রকমের নয়। জন্মলগ্নে রক্তে বিভিন্ন শ্রেণির কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাস্থ্যের অনুকূল থাকলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রধানত স্বাস্থ্যের পরিপন্থী জীবনশৈলীর জন্য কোলেস্টেরলের মাত্রা ও তার ধরনগুলোর আপেক্ষিক অনুপাতগুলো অস্বাস্থ্যকর হতে থাকে।

৩। রক্তে প্রবাহমান লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের (LDL cholesterol) মাত্রা বৃদ্ধির কারণে শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের রক্তনালীতে

কোলেস্টেরল ও আনুষঙ্গিক পদার্থ জমতে শুরু করে ও রক্তনালীগুলিকে পাকাপাকিভাবে সরু করে দেওয়া শুরু করে। এই প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে তাকে থামানো যায় না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের নবতম প্রযুক্তি ব্যবহার করা সত্ত্বেও রক্তনালী ক্রমশ সরু হতে থাকে। স্বাস্থ্যকর খাবারে অভ্যস্ত হওয়া, নিয়মিত এরোবিক শরীরচর্চা ও বিশেষ ক্ষেত্রে স্ট্যাটিন জাতীয় ওষুধের প্রয়োগে রক্তে অস্বাস্থ্যকর উচ্চ মাত্রার লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এই রকম কৃত্রিম উপায়ে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ফলে হৃদরোগ ও মস্তিষ্কের স্ট্রোক জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব ও রোগের ক্ষতিসাধন নির্ভরযোগ্যভাবে কমানো যায়।

৪। অধিক বা গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল (HDL cholesterol) রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এটা বেশি থাকা ভালো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শ্রমের অভাবে রক্তে এর মাত্রা কমে যেতে থাকে। এটা বাড়ানোর জন্য এরোবিক জাতীয় ব্যায়ামই সহজ ও পরীক্ষিত উপায়। রক্তে তুলনায় কম মাত্রার গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল থাকলেও ভারতীয়দের তাতে ক্ষতি হতে পারে—এটা জাতিগত ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

৫। শর্করাসমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস ভারতীয়দের উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের জন্য দায়ী। উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড সরাসরি ক্ষতিসাধন না করলেও এর ফলে লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে, আপাত-স্বাভাবিক লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলও রোগের বোঝা বাড়ায়।

৬। আপাত সুস্থ ব্যক্তির ২০ থেকে ৩০ বৎসর বয়স থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় (মোটামুটি প্রতি ৫ বছর) অন্তর রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নির্ণয় করা উচিত।

৭। দেখা গেছে কোলেস্টেরলের এমন কোনো নিম্নসীমা অর্জন করা সম্ভব নয় যার চেয়ে আরও কম করতে পারলে অতিরিক্ত লাভ হবে না। তাই কোলেস্টেরলের মাত্রা নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকের আরও বেশি করে কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাস্থ্যের অনুকূল করার প্রয়োজনে শর্করা জাতীয় খাবার ও মিষ্টি খাবারের পরিমাণ মোট ক্যালরির ৫০ থেকে ৬০ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত আর দৈনিক ৩০ মিনিট থেকে ৬০ মিনিট এরোবিক জাতীয় ব্যায়াম করা উচিত। কারণ, বিনা ওষুধের কোলেস্টেরল কমানোর এই প্রচেষ্টা দু-টির কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

৮। কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ব্যক্তি বিশেষের রোগসম্ভাবনা অথবা রোগের তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী কখনো কখনো কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধের প্রয়োজন হয়। কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলেও উল্লেখযোগ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না হলে সেগুলো জীবনভর চালিয়ে যেতে হয়।

৯। কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ হিসাবে ''স্ট্যাটিন'' জাতীয় ওষুধ বিগত শতাব্দীর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। যদিও সচেতনতা ও আর্থ-সামাজিক প্রতুলতার অভাবে এর সার্বজনীন প্রয়োগ এখনও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম, তবুও এর সীমিত প্রয়োগে হৃদরোগের প্রকোপ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

লেখক পরিচিতি: ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম (কার্ডিও), হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

With Best Compliments from

A

Well Wisher

অচেনা আঞ্জনি

চোখের পাতায় আমাদের অতি চেনা রোগ আঞ্জনি— তাই নিয়ে জানা-অজানা নানান কথা লিখছেন—
ডা. চন্দন বারি।

চোখের পাতায় (eyelid) কিছু হলেই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করি দেখুন তো আমার চোখে আঞ্জনি হয়েছে কি? চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায়. আঞ্জনিকে বলা হয় স্টায়ি (stye) যা External Hordeolum। আমাদের চোখের পাতায় যে রোম (eyelash) থাকে, তার গোড়ায় যদি জীবাণু দ্বারা (মূলত স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস) হঠাৎ করে সংক্রমণ হয়, তাকে আমরা বলি স্টায়ি হয়েছে। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে চোখের পাতার রোমের গোড়ায় ফোলা হয়েছে, সঙ্গে ব্যথাও। আর তার গোড়ায় সাদা বা হলদেটে পুঁজও দেখা যায়। গরম সেঁক, মুখে খাবার অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ, ব্যথা কমাবার বড়ি ও চোখে অ্যান্টিবায়োটিক—দিনে আই ড্রপ ও রাতে মলম হিসেবে লাগাতে বলা হয়। যে রোমের গোড়ায় পুঁজ রয়েছে সেটা তুলে দিলে তাড়াতাড়ি সেরে যায়।

আঞ্জনি

কিন্তু অনেক সময় চোখের পাতার মাঝে (stye-এর মতো চোখের পাতার প্রান্ত বা বর্ডারে নয়) ব্যথাহীন শক্ত ফোলা দেখা যায়। তাকে বলা হয় ক্যালাজিয়ন (chalazion)। চোখের পাতায় বিশেষ কিছু গ্রন্থির (meibomian gland) দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে (chronic inflammation)-র জন্য ক্যালাজিয়ন হয়। গ্রন্থির আকার ছোটোবড়ো হতে পারে। ওই বিশেষ গ্রন্থি অর্থাৎ meibomain gland থেকে যে নিঃসরণ হয় চোখের জল ও চোখের সাদা ও কালো অংশের ওপর জলের পাতলা পর্দা (tear film) তৈরিতে সাহায্য করে। সেই নিঃসৃত রস বাইরে না বেরোতে পেরে চোখের পাতার ভেতরে প্রদাহ তৈরি করে গ্রন্থির মধ্যেই থেকে যায়। ব্যথা না থাকার জন্য অনেকদিন ধরে থাকলেও দেখতে খারাপ লাগা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো অসুবিধা হয় না। ক্যালাজিয়নের চিকিৎসা হিসেবে মূলত গরম সেঁক দিয়ে ফোলাটা ম্যাসাজ করতে বলা হয়। চোখে অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড আইড্রপ দেওয়া হয়। অনেক সময় চোখের পাতার মধ্যে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন (injection triamcinotone) দেওয়া হয়। এগুলো কিছু ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ঠিক হয়ে গেলেও অনেক সময়ই অপারেশন (incision & curretage পদ্ধতিতে, চোখের পাতা অবশ করে) করে ভেতরে জমা পদার্থ বের করে দিতে হয়। সাধারণত চোখের পাতার ভেতরে কাটার জন্য ও সেলাই না দিতে হওয়ায় রোগীকে ভর্তি না করেই অপারেশন করে কিছুক্ষণের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাইরে কোনো দাগ থাকে না। কোনো কোনো সময় এই গ্রন্থিতে (meibomian gland) জীবাণু সংক্রমণ হলে ব্যথা হয়। তাকে বলা হয় ইন্টারন্যাল হরডিওলাম (internal hordeolum)। ক্যালাজিয়ান অনেক সময় বারে বারে হয় (recurrent chalazion), দু-চোখেও হতে পারে, উপর বা নীচ দু-টো পাতাতেও হয়।

মূলত চোখের 'পাওয়ার'-এ গণ্ডগোল (refractive error) থাকলে স্টায়ি বা ক্যালাজিয়ন (stye or chalazion) হতে পারে। সেজন্য চোখের 'পাওয়ার পরীক্ষা করা অবশ্যই দরকার। প্রয়োজন হলে চোখে ওষুধ দিয়ে (cycloplegic refraction) পরীক্ষা করতে হবে। এছাড়া ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে নেওয়াও উচিত। অনেক সময় চোখের পাতায় সাদা খুসকির মতো দেখা যায় (blepharitis), তার জন্যও চোখে আঞ্জনি হতে পারে। মাথায় খুশকি (dandruff) থাকলে চোখের পাতায় খুশকি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সুতরাং মাথার খুশকির চিকিৎসা দরকার হতে পারে। যারা চোখে কাজল পড়েন বা চোখের পাতায় বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক দ্রব্য ব্যবহার করেন দিনের শেষে অবশ্যই সেগুলো ভালো করে পরিষ্কার করবেন, নচেৎ গ্রন্থিগুলির মুখ বন্ধ হয়ে আঞ্জনি হতে পারে।

তাই সাধু সাবধান! আঞ্জনি হয়েছে বলে অবহেলা না করে চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লেখক পরিচিতি: ডা. চন্দন বারি, এমবিবিএস, ডিওএমএস, চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী
একুশ শতকের যুক্তিবাদী
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র
৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬
যোগাযোগ : ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২
এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

শিশু ও নবজাতকের খাদ্য খাবার

অষ্টম পরিচ্ছেদ

৬ মাস বয়সের পরে শিশুর খাবার

৬ মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে কেবল মায়ের দুধই খাওয়াতে হবে। মা-র দুধ না পেলে অন্য কিছু, কিন্তু সেগুলো সবই মায়ের দুধের চাইতে নিকৃষ্ট। আর ৬ মাস বয়স পেরিয়ে গেলে দিতে হবে অন্য খাবার। কী কী খাবার? কেমন করে খাওয়াবেন? কী করে বুঝবেন শিশুর পুষ্টি ঠিকমতো হচ্ছে কি না? উত্তর দিচ্ছেন— **ডা. স্বপন বিশ্বাস**।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে 'ওয়েনিং' (Weaning)। এর সমার্থক বাংলা শব্দ অনেক চেষ্টা করেও পাইনি। যা দু-একটা পেয়েছি, তা আমার মনঃপূত হয়নি। কারও জানা থাকলে বলতে পারেন। 'ওয়েনিং' মানে কি মুখে ভাত বলব? ৬ মাসের পরে কোনো এক শুভ দিনে অনেক হিন্দু বাঙালি শিশুর মুখে যখন প্রথম ভাত তুলে দেওয়া হয়? মাছে ভাতে বাঙালি। না, মুখে ভাত-ও ঠিক প্রতিশব্দ নয়। কেননা, মুখে ভাত বলতে লোকে বোঝে অন্নপ্রাশন, যার সঙ্গে একটা ধর্মীয় অনুষঙ্গ আছে। তা ছাড়া দুধের বদলে অন্য খাবার মানে বা সবসময় 'ভাত'-ই হবে, তাও তো নয়। ইংরাজি ওয়েনিং মানে শিশুকে দুধের বদলে অন্য খাবার ধরিয়ে ধীরে ধীরে দুধ ছাড়িয়ে দেওয়া। সেই দুধ বুকের দুধও হতে পারে আবার বাইরের দুধও হতে পারে। অর্থাৎ শিশুকে দুধের বদলে প্রথম শক্ত খাবার দেওয়া। শিশুর বড়ো হওয়ার প্রথম ধাপ।

ছবি

একটা সময় ছিল, যখন ৪ মাস বয়সের পর থেকেই শিশুকে শক্ত খাবার দেওয়ার সুপারিশ করা হত। কিন্তু বর্তমানে শিশুকে ৬ মাস বয়সের পরে শক্ত খাবার দিতে বলা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০১ সালে ঘোষণা করেছে, প্রতিটি শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত Exclusive breast feeding করানো উচিত। Exclusive breast feeding-এর অর্থ শিশু মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কিছুই খাবে না। ইংল্যান্ডের SACN (Scientific Advisory Committee on nutrition) বলেছে যে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর শরীর গঠনে মায়ের দুধই যথেষ্ট। ২০০৩ সালে সে দেশের স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে ২৬ সপ্তাহ পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র স্তনদুগ্ধই পান করাতে হবে—২৬ সপ্তাহ মানে ৬ মাস।

৬ মাস বয়সের পরে শক্ত খাবার দিতে বলা হয়, কারণ

১। ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বুকের দুধই শিশুর সব রকমের পুষ্টি জোগায়।

২। ৬ মাস বয়সের আগে শিশুর রেচনতন্ত্র, কিডনি ও পরিপাকতন্ত্র পরিপক্কতা লাভ করে না। ফলে তার আগে শক্ত খাবার দিলে হজমে সমস্যা হতে পারে ও কিডনির ওপর চাপ পড়ে।

৩। বুকের দুধ আগে বন্ধ করে দিলে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হয়, ফলে অসুখবিসুখ বেড়ে যায়। সংক্রমণের হার বেড়ে যায়। শিশু অ্যালার্জি, অ্যাজমা, একজিমা, পেটের সমস্যায় বেশি ভোগে।

৪। ৬ মাস বয়সের পরে শিশু বাইরের খাবার খেতে শারীরিকভাবে সক্ষম হয়।

৫। তাই ESPGHAN (European Society for Paediatric gasteroenterology, Hepatology and Nutrition, 2008)-এর সুপারিশ হল— ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত।

এক কথায় বলা যায়, ৬ মাস পর্যন্ত শুধু দুধ খাওয়ানো, দুধে কম পড়লে ৪ মাসের পর থেকে শক্ত খাবার শুরু করুন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুধও খাইয়ে যান। কোনো অবস্থাতেই ১৭ সপ্তাহের আগে বা ৮ মাসের পরে শক্ত খাবার শুরু করা উচিত নয়।

প্রথম কী কী খাবার দেওয়া যাবে?

দুধের বদলে শিশুকে কী খাবার দেওয়া হবে, তা নির্ভর করবে শিশুর বয়সের ওপর। বয়সের ওপর নির্ভর করে ১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্য-খাবারকে ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনায় ১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে কী খাওয়াবেন তাই নিয়ে আলোচনা করব, কারণ এক বছর বয়সের পরে শিশু বাড়ির বড়োদের মতো সব খাবারই খাবে। এই পর্যায়গুলি হল—

১। ৪-৬ মাস বয়সের খাবার বা প্রথম পর্যায় (1st stage)

২। ৬-৯ মাস বয়সের খাবার বা দ্বিতীয় পর্যায় (2nd stage)

৩। ৯-১২ মাস বয়সের খাবার বা তৃতীয় পর্যায় (3rd stage)

দুধের পরিবর্তে খাবার দেওয়ার আগে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রাখতে হবে। ৬ মাসের পরে শিশুর পৌষ্টিক তন্ত্র পরিপক্কতা লাভ করে, ফলে সে অনেক কিছু হজম করতে পারে। ৭ মাসের পরে শিশুর মাড়ী শক্ত হয়ে দাঁত ওঠে, তখন সে কামড়ে খাবার খেতে চায়। তেমনি যখন শিশু হাত দিয়ে খাবার মুখে নিতে পারবে, তখন সে হাত দিয়েই খাবার খেতে চাইবে। তাই ইচ্ছেমতো খাবার স্বাধীনতা ও উপাদান

তাকে দিতে হবে। জোর করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে সে প্রতিবাদ করবে, খেতে চাইবে না, বমি করবে—মা-ও তার গাল টিপে খাওয়াবেন। শুরু হবে মায়ের অভিযোগ, শিশু খায় না, শিশু কিছু বলতে পারবে না, কিন্তু মনে মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। তারপর তার কাছে যে খাবারই আনা হোক না কেন, সে খাবে না। কাঁদবে, বমি করবে, তিক্ত সম্পর্কের সূত্রপাত হবে।

শিশুদের খাদ্য-খাবার

শিশুদের খাদ্যকে আমরা ৫ ভাগে ভাগ করে নিতে পারি।

১। **দানাশস্য**: যেমন চাল, গম বা আটার রুটি, জোয়ার, বাজরা, ওটমিল যব, বার্লি, পাস্তা ইত্যাদি।

২। **ফলফলাদি**: আপেল, কলা, আঙুর, কিশমিশ, নাসপাতি, বেঁচি জাতীয় ব্লুবেরি, পেঁপে, তরমুজ, এপ্রিকট, কমলা লেবু, মুসুম্বি লেবু, আম, আনারস, অ্যাভোকাডো, কিউই ফল, স্ট্রবেরি, চেরি, কুল জাতীয় ফল ইত্যাদি।

৩। **তরিতরকারি**: গোল আলু, রাঙা আলু, বিট-গাজর, কাঁচকলা, কাঁচা পেঁপে, বোরোক্কলি, ফুলকপি, স্কোয়াশ, বিন, শিম, ওল বা শালগম জাতীয় তরকারি, কুমড়ো, শশা, পেঁয়াজ, পালং শাক, টম্যাটো, বিভিন্ন প্রকার ডাল ও তৈলবীজের খাবার ইত্যাদি।

৪। **মাছ-মাংস**: চিকেন, গোরুর মাংস, খাসির মাংস, শুকরের মাংস, মাছ, ডিম ইত্যাদি। এখানে পরিবারের এবং ধর্মের কিছু বিধিনিষেধ থাকতে পারে। কিন্তু পুষ্টি বিজ্ঞান বলছে শিশুকে বয়স অনুসারে মাছ-মাংস খাওয়ানো যাবে।

৫। **দুধ ও দুগ্ধজাত**: গোরুর দুধ, দুধের তৈরি দই, লস্যি, ঘোল, চিজ, পুডিং ইত্যাদি।

কোন বয়সে কী খাবার দেওয়া যায়

১। ৪-৬ মাস বয়সের খাবার বা প্রথম পর্যায় (1st stage)

কী ধরনের খাবার দেওয়া যাবে?

এই বয়সে শিশুর খাবার হবে মিহি ও পাতলা। তাই যে খাবার দেওয়া হবে, তাকে ভালো করে সেদ্ধ করে পিষে বা মিক্সিতে মিহি করে পাতলা স্যুপের মতো করে খাওয়াতে হবে। খাবার দুধের সঙ্গে গুলে পাতলা করে নিতে হবে, যাতে শিশু সহজে গিলতে পারে। খাবার ঠান্ডা করে নিতে হবে,

চিত্র ২. ৪-৬ মাস বয়সের পাতলা মিহি খাবার

ইষদুষ্ণ খাবারও খাওয়ানো যায়।

কী কী খাবার দেওয়া যায়?

- চাল বেটে গুঁড়ো করে রান্না করা ভাত অর্থাৎ গলা ভাত এই বয়সে সবচেয়ে ভালো খাবার, আর বাংলায় এটা পাওয়া সোজা ও সস্তা। এ ছাড়া ওট, রাই বার্লিও দেওয়া যেতে পারে।
- ফলের মধ্যে দেওয়া যায় কলা, আপেল বা আপেল জাতীয় ফল (Nactarine), নাশপাতি, অ্যাভোকাডো (Avacado), কুল জাতীয় ফল। শক্ত ফল খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে লেই করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।
- তরকারির মধ্যে দেওয়া যেতে পারে গোল আলু, রাঙা আলু, গাজর, কুমড়ো, স্কোয়াশ।
- দুগ্ধজাত খাবারের মধ্যে মিষ্টি ছাড়া কাস্টার্ড বা ঘরে-পাতা দই দেওয়া যায়।

চিত্র ৩. ৪-৬ মাস বয়সের খাদ্য: বিভিন্ন ফল

কীভাবে খাবার তৈরি করবেন?

যে খাবার দেওয়া হবে, আগে তা পরিষ্কার করে, খোসা থাকলে খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়ে পিষে বা বেটে মিহি করে নিতে হবে। তার এক চামচের সঙ্গে ৫ চামচ পরিমাণ শিশু যে দুধ খায়, সেই দুধের সঙ্গে ভালো করে মেশাতে হবে। সেই আধা তরল মিশ্রণ শিশুকে খাওয়াতে হবে।

চিত্র ৪. ৪-৬ মাস বয়সে প্লাস্টিকের চামচে খাওয়ানো

কতটা খাওয়াবেন?

দুধের পরিবর্ত খাবার খাওয়ানো শুরু করলেও এই বয়সে শিশুর প্রধান খাদ্য দুধই। শিশু তার খাবারের ৬ ভাগের ৫ ভাগ খাবে দুধ আর অন্য খাবার খাবে ১ ভাগ।

প্রথম খাওয়ানোর সময় প্লাস্টিকের চামচে খাওয়ানো ভালো। চামচের অর্ধেক ভর্তি করে শিশুর মুখে ধরতে হবে। স্বাভাবিকভাবে এই শিশু খাবার মুখে নিয়ে নতুন খাবারের আস্বাদন নেবে। প্রথম দিকে সে নাও খেতে

পারে, পরে আস্তে আস্তে খাওয়া শিখবে। প্রথম প্রথম ২-৩ টেবিল চামচ দিনে ১-২ বার করে দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে ও বেশিবার খাওয়ানো যাবে।

যে শিশু মায়ের দুধ খায়, তার কতটা ঘাটতি তা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে শিশুর খাবার ইচ্ছা ও চাহিদার উপর নির্ভর করে পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। যেহেতু দুধই শিশুর প্রধান খাদ্য, তাই দুধ খাওয়ানোর পরে বা আগে শিশুকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত। দুধ খাবার মধ্যবর্তী সময়েও খাওয়ানো যেতে পারে, কিন্তু খুব ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিশুকে এই খাবার দেওয়া উচিত নয়। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন শিশুকে প্রথম প্রথম শক্ত খাবারে অভ্যস্ত করতে হবে।

এই বয়সে কী খাবার দেওয়া উচিত নয়

- আটা বা গমজাত খাবার দেওয়া উচিত নয়।
- অন্য যেসব খাবার এই বয়সে দেওয়া যাবে না কিন্তু আমাদের দেশে দেওয়ার চল আছে, সেই কয়েকটা খাবার হল—সিমাই, পাস্তা, ডালিয়া বা এরকম রেডিমেড বড়ো দানার খাবার, গোরুর দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ও বাদাম জাতীয় খাবার।
- নুন, চিনি, মধু ১ বছরের আগে দেওয়া উচিত নয়।

দরকারি কথা:

- এই সময়ে শিশুর প্রতিদিন প্রায় ৬০০ মিলিলিটার দুধের প্রয়োজন হয়। অন্য খাবার দিলেও খেয়াল রাখতে হবে, শিশু যেন তার প্রয়োজনীয় দুধ পায়।
- দু-বার খাওয়ানোর মাঝে ফোটানো জল ঠান্ডা করে খাওয়ানো যেতে পারে।
- সরাসরি গোরুর দুধ খাওয়ানো যাবে না, তবে দুগ্ধজাত খাবার দই বা কাস্টার্ড দেওয়া যাবে।
- খাবার কখনোই বোতলে খাওয়ানো উচিত নয়। বাটি চামচে খাওয়াতে হবে।
- শিশুর প্রথম খাবার এমন সময়ে দিতে হবে, যখন মা ও শিশু দু-জনেই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন থাকে।
- খাওয়ানোর আগে বাটি চামচ জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- অল্প পরিমাণ খাবার নিয়ে প্রথমে শিশুর মুখে ধরতে হবে। সে যদি অল্প খায় বা না খায়, জোর করার দরকার নেই।
- ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পরে প্রতিদিন ৩ বার এই শক্ত খাবার দেওয়া যাবে।
- এক খাবার না দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন খাবার দিতে হবে। এভাবে চেষ্টা করতে পারেন:

	প্রথম ২ সপ্তাহ	**পরের ২ সপ্তাহ**	**৫-৬ মাস**
দিনে কতবার খাওয়াবেন	**১**	**২**	**৩**
প্রাতঃরাশ	বুকের দুধ বা নিরুপায় হলে ফর্মুলা দুধ	ভাত দুধের সঙ্গে মিশিয়ে লেই করে	ভাত দুধের সঙ্গে মিশিয়ে লেই করে
দুপুরে	বুকের দুধ বা নিরুপায় হলে ফর্মুলা দুধ	বুকের দুধ বা নিরুপায় হলে ফর্মুলা দুধ	ডাল / সবজি বা মাছ মাংস নরম পেস্ট করে।
বিকালে	ভাত দুধের সঙ্গে মিশিয়ে লেই করে	ফল বা সবজির মিশ্রণে দুধ মিশিয়ে	ফল নরম পেস্ট করে ও দুধ
রাত্রে / সন্ধ্যায়	বুকের দুধ বা নিরুপায় হলে ফর্মুলা দুধ	বুকের দুধ বা নিরুপায় হলে ফর্মুলা দুধ	বুকের দুধ বা নিরুপায় হলে ফর্মুলা দুধ

২। ৬-৯ মাস বয়সের খাবার বা দ্বিতীয় পর্যায় (2nd stage)

৬ মাস বয়সের পরে শিশুর আরও শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। সে সব কিছু নিয়ে নিজেই মুখে দিতে চায়। শিশু দুই হাতে ধরে খেতে শেখে। তাকে কোনো খাবার ধরিয়ে দিলে সে নিজেই খাবার মুখে নিতে পারে। এই সময় কাপের থেকে জল চুমুক দিয়ে খাওয়াও শিশুর আয়ত্তে আসে। ৭ মাস বয়সের পরে মাড়ী শক্ত হয়ে যখন দাঁত ওঠে তখন সে আরও শক্ত জিনিস কামড়ে খেতে চায়। তাই শিশুর চাহিদা অনুযায়ী তার খাবার নির্বাচন করতে হয়।

কী ধরনের খাবার দেওয়া যাবে?

পাতলা স্যুপ জাতীয় খাবার থেকে আস্তে আস্তে শিশুকে একটু একটু করে শক্ত খাবার দিতে হবে। স্যুপ থেকে একটু গাঢ় লেই করে, তারপর থকথকে করে, তারপর মণ্ড করে খাওয়ানো যায়। প্রথমে মিক্সিতে দিয়ে

চিত্র ৫. ৬-৯ মাস বয়সের খিচুরি জাতীয় খাবার

একদম মিহি করে, তারপর বেটে, তারপর হাত দিয়ে পিষে বা চামচ দিয়ে পিষে নরম দানা যুক্ত খাবারও দেওয়া যায়। ৭ মাস বয়সের পরে শিশু ধরতে পারে এরকম কাঠির মতো করে তৈরি করা নরম খাবার দেওয়া যায়।

যে খাবারই খাওয়ানো হোক না কেন, আগে সেই খাবার তৈরি করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা করতে হবে। শিশুকে ৪ মাসের পরে শক্ত খাবার ধরানো হয়েছে, সে ৬ মাসের পরে আরও শক্ত লেই বা মণ্ড জাতীয় খাবার খেতে পারবে, কিন্তু যে শিশুকে ৬ মাস বয়সের পরে প্রথম অন্য খাবার দেওয়া হবে, তাকে আগে খাবার পাতলা করে, নরম করে এক দু-সপ্তাহ খাওয়াতে হবে। তারপর খাবার আস্তে আস্তে গাঢ় করে খাওয়ানো যাবে।

কী কী খাবার দেওয়া যায়?

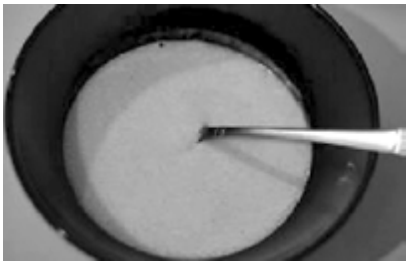

চিত্র ৬. ৬-৯ মাস বয়সের খাদ্য সুজি বা পরিজ

৬ মাসের আগে যেসব খাবার দেওয়া হচ্ছিল, সেগুলি তো দেওয়া যাবেই, তার সঙ্গে গমজাত খাদ্য, আটার রুটি, পাঁউরুটি, পাস্তা, সুজি, পরিজ ইত্যাদি যোগ করে যেতে পারে। ফলের মধ্যে পাকা পেঁপে, তরমুজ জাতীয় ফল, এপ্রিকট, কিশমিশ, বৈঁচি বা ব্লুবেরি জাতীয় ফল, আঙুর ইত্যাদি যোগ করা যাবে। সবজির মধ্যে বিভিন্ন রকমের ডাল, বিনস, মটর, ফুলকপি, বোরোক্কোলি বা এই ধরনের সবজি দেওয়া যাবে। এই বয়সে ডিম, মাছ বা মাংস দেওয়া যাবে।

কীভাবে খাবার তৈরি করবেন?

- চিকেন বা মাংসের কিমা বা মাছ ভালো করে সেদ্ধ করে আঙুলের সাহায্যে চেপে বা পিষে খাওয়াতে হবে।
- ডিম খুব ভালো করে সেদ্ধ করে শক্ত কুসুম ও সাদা অংশ হাত দিয়ে পিষে ছোটো করে খাওয়ানো যাবে।

চিত্র ৭. ৬-৯ মাস বয়সের শিশুর জন্য চটকানো খাবার

- ভাত, আটার রুটি, পাস্তা ওটমিল, কর্নমিল, আলু ভালো করে রান্না করে পিষে নরম করে খাওয়ানো যাবে।
- বিভিন্ন রকমের ডাল, মটর, বিনস, শিম, ফুলকপি, গাজর ইত্যাদি সবজিও ভালো করে সেদ্ধ করে নরম করে চামচ বা আঙুল দিয়ে পিষে বা ঘেঁটে খাওয়ানো যাবে।
- এছাড়া পাকা নরম ফল যেমন, কলা, আম, তরমুজ, পাকা পেঁপে সরাসরি ছোটো করে কেটে শিশুকে দেওয়া যাবে।
- সেদ্ধ করে নরম করা আপেল, এপ্রিকট, নাশপাতি দেওয়া যাবে। রসালো ফল যেমন স্ট্রবেরি বা জামও দেওয়া যায়।
- সরাসরি গোরুর দুধ না খাওয়ানো গেলেও দুগ্ধজাত খাবার যেমন পুডিং, দই বা লস্যি দেওয়া যায়। তা ছাড়া পেষাই করা খাবারের সঙ্গে দুধ মিশিয়েও খাওয়ানো যায়।

ফিঙ্গার ফুড (Finger food)

চিত্র ৮. ৭ মাসের পর দিন ফিঙ্গার ফুড

হাতে ধরে খেতে পারে এমন খাবারকে ইংরেজিতে বলা হয় ফিঙ্গার ফুড (Finger food)। ৭ মাসের পর যখন শিশু কামড়ে খেতে চায়, তখন সে যা পায় তাই মুখে দেয়। বড়ো কোনো খাবার খেতে পারে না, আবার ছোটো সাইজের খাবার ধরতে পারে না। তখন শিশুকে লম্বা কাঠির মতো করে তৈরি করা খাবার দিতে হয়। শিশু সেই কাঠির মতো খাবার ধরে নিয়ে মুখে দিয়ে কিছুটা মাঢ়ী বা দাঁতে চেপে খেয়ে নিতে পারে। এতে সে আনন্দ পায়, তার মাঢ়ী শক্ত হয়, পরবর্তী সময়ে কথাও আগে বলে। মুখের পেশি জোরালো হয়। যেসব খাবার এভাবে দেওয়া যেতে পারে—

- লম্বা করে তৈরি করা টোস্ট, রুটি বা পাউরুটি।
- পাকা কলা, লম্বা করে কাটা তরমুজ বা পাকা পেঁপে।
- সবুজ বিনস, লম্বা করে কাটা গাজর, ফুলকপি বা বোরোক্কোলি সেদ্ধ করে।
- চালের পিঠে, লম্বা করে বানিয়ে।
- লম্বা সাইজের পাস্তা রান্না করে ঠান্ডা করে।

কতটা খাওয়াবেন?

- ৬ মাস বয়সের পরে শিশুর মোট খাবারের ৮ ভাগের ৪ ভাগ দুধ, ১ ভাগ মাছ বা মাংস এবং ৩ ভাগ ভাত / রুটি, ফলমুল-সবজি থাকা উচিত।
- অন্য হিসাবে,১ ভাগ মাছ / মাংস দিলে ২ ভাগ ডাল, ৩ বা ৪ ভাগ সবজি আর ৩ বা ৪ ভাগ ভাত, রুটি, ওট ইত্যাদি দেওয়া উচিত। এছাড়া—অন্য সব খাবারের মিলিত পরিমাণের সম পরিমাণ দুধ খাবে।

- প্রতিদিন শিশুকে ১/৪-১/২ কাপ ভাত দিনে একবার, ১/৪-১/২ কাপ সবজি দিনে ১ থেকে ২ বার, ১/৪-১/২ কাপ ফল দিনে ১ থেকে ২ বার এবং মাছ বা মাংস ১ টেবিল চামচ দিনে ১-২ বার দেওয়া যাবে।
- ৭ মাস বয়সের পরে সারাদিনে ৩ বার এই শক্ত খাবার দেওয়া যেতে পারে।
- এই খাবার খেলেও শিশুর প্রতিদিন ৫০০-৬০০ মিলিলিটার দুধের প্রয়োজন হয়। সেই দুধও তাকে দিতে হবে। শিশু দৈনিক ৩ বার শক্ত খাবার খাওয়া অভ্যাস করার পরে দুধের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমিয়ে শক্ত খাবারের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

কী খাবার দেওয়া উচিত নয়?

এই বয়সে বাদাম জাতীয় শক্ত খাবার দেওয়া উচিত নয়, কারণ বাদামে অ্যালার্জি প্রায়ই দেখা যায়, তা ছাড়া বাদাম শিশুর গলায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্য যেসব খাবার শক্ত এবং গলায় আটকে যেতে পারে, তাও দেওয়া উচিত নয়।

দরকারি কথা

১। প্রথম দিকে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট সময় দিন। মনে রাখুন, শিশু তার জীবনে প্রথম বারের জন্য নতুন স্বাদের খাবার নতুনভাবে খাওয়া শিখছে। খাবারের গন্ধ বা স্বাদ তার পছন্দ নাও হতে পারে। ধৈর্য ধরে তাকে সাহায্য করুন।

২। শিশুর খাবার যেন পরিষ্কার ও টাটকা হয়। শিশু যতটা খাবার খাবে ততটাই তৈরি করুন। একবার তৈরি করে সেই খাবার বার বার খাওয়াবেন না। প্রতিবার খাওয়ানোর পরে শিশুর মুখ পরিষ্কার করুন।

৩। যতটা সম্ভব বোতল ত্যাগ করুন, শিশুকে জল এবং শক্ত খাবার কাপে খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। ঢাকনা আছে এমন কাপ ব্যবহার করা উচিত।

৪। শিশুর চোখে চোখ রেখে, কথা বলে আনন্দ দিয়ে তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। শক্ত খাবার দেওয়ার সময় নজর রাখুন শিশু ঠিকমতো খেতে পারছে কি না।

৫। কখনো খাওয়ানোর জন্য জোর করবেন না। শিশু খেতে না চাইলে খাওয়া বন্ধ করে দিন। বেশি সময় ধরে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে সে বুঝে যাবে, খেতে না চাইলেই আপনি তার কাছে বেশিক্ষণ থেকে তাকে তোয়াজ করবেন। তখন এরকমই চলবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খাওয়ানো চলতে থাকবে।

৬। কোনো নতুন খাবার শিশু খেতে না চাইলে তখনকার মতো সে খাবার বাদ দিন। পরে আরেক দিন চেষ্টা করুন।

৭। শিশুকে তার নিজের হাতে খাওয়ানোর অভ্যাস করান। এতে সে আনন্দ পাবে।

৮। শিশুর সঙ্গে সঙ্গে পাশে বসে নিজে নিজের খাবার খান। শিশু আপনার খাবার দেখে দেখে খাওয়া শিখবে।

৯। সবসময় বাড়িতে তৈরি খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। বাইরের প্যাকেটের খাবার কিনে খাওয়ালে প্যাকেট খোলার আগে ঠিকভাবে নির্দেশ পরে নিন।

১০। শিশুকে তার হাত দিয়ে বা চামচে ধরে খাওয়া অভ্যাস করাতে হবে। হাতে ধরে হয়তো প্রথমে শিশু খেতে পারবে না, যতটা খাবে তার বেশি ফেলবে, তবু এভাবে খেলে শিশুর খাওয়ার আগ্রহ বাড়বে। সে সহজে আনন্দ করে খাবে।

১১। এত সব খাবারের মধ্যে থেকে মাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাবার তৈরি করতে হবে, যাতে শিশু খাবারের বিভিন্ন স্বাদ পায়, তার খাবারের একঘেয়েমি কাটে। এ ছাড়া মায়ের আরেকটি বিষয়ের ওপর নজর দিতে হবে, তা হল খাদ্যগুণ। এই সময়ে আয়রন যুক্ত খাবারের প্রয়োজন। তাই যেসব খাবারে আয়রন আছে, যেমন মাংস, ডিমের কুসুম, সবুজ শাকসবজি, বিনস, ডাল, শিম জাতীয় খাবার দিতে হবে। ভিটামিন 'সি' না থাকলে শরীরে আয়রন শোষিত হয় না, তাই ভিটামিন 'সি' যুক্ত খাবারও দিতে হবে। যেসব খাবারে ভিটামিন 'সি' আছে তাদের মধ্যে কমলা লেবুর রস (১ ভাগ রস ১০ ভাগ জলের সঙ্গে মিশিয়ে) টম্যাটো এই বয়সে দেওয়া যায়।

	প্রথম দিন	দ্বিতীয় দিন	তৃতীয় দিন
সকালে	ভাত বা কর্নমিল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে	আটার রুটি বা অন্য দানা শস্য খাবার দুধের সঙ্গে মিশিয়ে	কলা থেঁতো করে টোস্টের সঙ্গে
দুপুরে	সিমাই বা পাস্তা জাতীয় খাবার	মাংসের কিমা সেদ্ধ করে তরকারির সঙ্গে বা নরম আলুর সেদ্ধ পেস্টের মতো করে বা আপেল / পাকা ন্যাসপাতি সেদ্ধ করে নরম করে।	ডাল ও সবজি সেদ্ধ করে সুজির সঙ্গে।
বিকালে	মাছ, ফুলকপি, আলু এক সঙ্গে রান্না করে বেটে নরম করে ঘেঁটে খাওয়ানো যায়। ফিঙ্গার ফুড হিসাবে নরম রান্না করা গাজর লম্বা করে কেটে দেওয়া যায়	ডিম টোস্ট	ম্যাকারনি জাতীয় খাবার, চিজের সঙ্গে।
রাত্রে	দুধ	দুধ	দুধ

১২। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন খাবার দিন। এভাবেও দিয়ে দেখতে পারেন—

৩। ৯-১২ মাস বয়সের খাবার বা তৃতীয় পর্যায় (3rd stage)

চিত্র ৯. নিজে হাতে ফেলে ছড়িয়ে

কী ধরনের খাবার দেওয়া যাবে?

এই বয়সে শিশুর দাঁত উঠে যায়, সে শক্ত খাবার খেতে অভ্যস্ত হয় এবং খেতে চায়। তাই তাকে আরও শক্ত খাবার, এমনকী কাটা ফল-ফলাদিও দেওয়া যেতে পারে। শিশুর এই বয়সে বেশি ক্যালোরির দরকার হয়, আর ফ্যাটে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি থাকে, তাই ফ্যাট জাতীয় খাবারও শিশুর বেশি প্রয়োজন হয়। লো-ফ্যাট, লো-ক্যালোরি খাবার এই সময়ে বর্জন করতে হবে।

কী কী খাবার দেওয়া যায়?

একটা পরিবারের বড়োরা যে ধরনের খাদ্য-খাবার খায়, শিশুকে সেইসব খাবারই দেওয়া যায়, শুধু এমন খাবার দেওয়া উচিত নয়, যা গলায় আটকে যেতে পারে।

শর্করা-প্রধান খাবার, যেমন—ভাত, রুটি, আলু, পাস্তা ইত্যাদি দেওয়া দরকার। তবে শুধু শর্করা-প্রধান খাবার না দিয়ে তার সঙ্গে ফল ও শাকসবজি মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত। প্রধান খাবারের সঙ্গে সবসময় সবজি দেওয়া দরকার। ফল টিফিনে অথবা প্রধান মিলের সঙ্গে দেওয়া যায়।

চিত্র ১০. ৯-১২ মাস বয়সে খাবারের সঙ্গে দিন সবজি

বুকের দুধ বা ফর্মুলা দুধ তো খাবেই, তার সঙ্গে দুগ্ধজাত খাবার যেমন দই, অল্প পরিমাণ চিজ, পুডিং ইত্যাদিও দেওয়া যায়। তবে বেশি চিনি মেশানো যাবে না।

মাছ, মাংস, ডিম তো খাবেই। এ ছাড়া ডাল, শিম জাতীয় তরকারি দিনে এক-দু-বার করে দেওয়া যায়।

শিশুকে এক খাবার না দিয়ে পালটে খাবার দেওয়া উচিত। বেশি আয়রনযুক্ত খাবার যেমন তেলের মাছ, মাংস, ডিম বা বিন, কাঁচকলা দেওয়া দরকার।

কীভাবে খাবার তৈরি করবেন?

চিত্র ১১. ৯-১২ মাস বয়সে বাড়ির সাধারণ খাবার

শিশু যেহেতু খাবার খেতে এই সময়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাই তার খাবার তৈরি নিয়ে সমস্যা কম। সেদ্ধ খাবার, বাড়ির রান্না করা খাবার, কাটা ফলফলাদি সবই এই বয়সের শিশু খেতে পারে। তার দাঁত ওঠে, সে শশাও কামড়ে খেতে পারে। ৯ মাস বয়সের শিশু ও ১২ মাস বয়সের শিশুর তফাত থাকে, তাই ছোটো শিশুর উপর বেশি নজর রাখতে হবে বা তার খাবার একটু হাতে বা চামচে ঘেঁটে নরম করে খাওয়াতে হবে।

টিফিনে নরম কাটা ফল, সেদ্ধ করা সবজি, খোসা ছাড়ানো ফল (আপেল, নাশপাতি), কলা, শশা, গাজর ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। রুটি,টোস্ট, কেকও দেওয়া যায়। পাতলা করে ফলের রস দেওয়া যেতে পারে। দুগ্ধজাত দই, লস্যি বা চিজ দেওয়া যায়। মেরী বিস্কুট, অল্প মিষ্টি দই মাঝে মাঝে দেওয়া যেতে পারে।

কতটা খাওয়াবেন?

- প্রধান খাবার দিনে ৩ বার দিতে হবে। প্রাতঃরাশ, দুপুরের খাবার ও রাত্রের খাবার। মাঝে ২ বার বা ৩ বার টিফিন দেওয়া যায়।
- এই সময়েও শিশু দৈনিক ৫০০-৬০০ মিলিলিটার দুধ খায়। খাবার সময়ে জল বা খুব পাতলা ফলের রস খাওয়ানো যেতে পারে। প্রতিদিন ৩ বার প্রধান খাবার ও একবার বা দু-বার টিফিন দেওয়া যেতে পারে।
- ১০ মাস বয়সে শিশুর খাবারের ৩ ভাগ দুধ, ৪ ভাগ ফল। সবজি, ১ ভাগ মাছ / মাংস, ১ ভাগ ভাত / রুটি এবং
- ১ বছর বয়সে শিশুর খাবারের ৩ ভাগ দুধ, ৩ ভাগ ফল / সবজি, ১ ভাগ মাছ / মাংস, ২ ভাগ ভাত/রুটি দেওয়া উচিত।

কী খাবার দেওয়া উচিত নয়?

চীনেবাদাম জাতীয় শক্ত খাবার দেওয়া উচিত নয়। আগের মতো এগুলো গলায় আটকে যেতে পারে, অ্যালার্জি হতে পারে। এ ছাড়া যদি কোনো খাবার খাইয়ে শিশুর অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা যায়, সে খাবারও পরিত্যাগ করতে হবে। হোল কাউ মিল্ক ও জল না মেশানো গোরুর দুধ এ বয়সে

চলবে না। তবে অন্য শক্ত খাবারের সঙ্গে হোল কাউ মিল্ক মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

দরকারি কথা:

- সব ধরনের খাবার করে খাওয়ানো উচিত। ১২ মাসের পর থেকে বোতল একেবারেই পরিত্যাগ করা উচিত।
- শিশুকে নিজেদের খাবার সময় পাশে বসিয়ে খাওয়ান, যাতে সে বোঝে সেও বড়ো হয়ে গেছে এবং সে পরিবারের একজন। এতে তার খাবার আগ্রহ বাড়বে।
- চিনি বা মিষ্টি খাবার, ক্রিম, চকলেট বিস্কুট বা বিভিন্ন টফি এবং মিষ্টি শরবত টিফিনে বা দুই খাবারের মাঝের সময় দিলে তা দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকারক, তার মানে শিশুকে এসব একেবারেই দেওয়া যাবে না তা নয়, দুই খাবারের মাঝে না দিয়ে খাবারের শেষে দিলে ক্ষতি কম হয়।

এক বছরের আগে যেসব খাবার আদৌ দেবেন না বা বেশি দেবেন না।

- **নুন:** শিশুর খাবারে কোনোরকম নুন দেবেন না। বেশি নুনকে বের করার ক্ষমতা শিশুর কিডনির থাকে না। তাই নুন বা নুনে ভেজানো কোনো মাছ, মাংস, নোনতা খাবার শিশুকে এক বছর বয়স পর্যন্ত না দেওয়া উচিত। শিশু বাড়িতে তৈরি পরিবারের খাবার খেলে সেই খাবার রান্না করার সময় নুন খুব কম দিয়ে বা না দিয়ে রান্না করা উচিত।
- **চিনি:** নুনের মতো চিনিও পরিত্যাজ্য। চিনি জাতীয় খাবার দাঁতের ক্ষতি করে, নরম দুধ-দাঁতকে ক্ষয় করে দেয়। মিছরি বা তাল মিছরির জলও দেবেন না। বেশি সুগার জাতীয় খাবার শিশুর অতিরিক্ত ওজনও বাড়ায়।
- **মধু:** ১ বছর বয়সের আগে শিশুকে একদমই মধু খাওয়ানো উচিত নয়। মধুতে এক প্রকার ব্যাকটিরিয়া জন্মায়, এবং মারাত্মক রোগ 'ইনফ্যান্টাইল বটুলিজম' (Infantile botulism) মধু থেকে হতে পারে। তা ছাড়া মধুতে যথেষ্ট পরিমাণ চিনি বা মিষ্টি থাকে, যা দাঁতের ক্ষয় ও ক্ষতি করে।
- **বাদাম:** প্রথমত শিশু বাদাম খেতে পারে না। তার গলায় আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া যেসব শিশুর বা পরিবারের অ্যালার্জি বা হাঁপানি বা একজিমা থাকে তাদের তিন বছর বয়সের আগে বাদাম-জাত খাবার দিতে নেই।
- **লো-ফ্যাট লো-ক্যালরি, বেশি ফাইবার যুক্ত খাবার:** শিশুর পাকস্থলীর ক্ষমতা কম, তাই অল্প পরিমাণ খাবার খেতে পারে। কিন্তু বেড়ে ওঠার জন্য তার ক্যালোরি বেশি দরকার হয়। এইজন্য কম ক্যালোরির খাবার শিশুকে দেওয়া উচিত নয়। আবার বেশি ফাইবার যুক্ত খাবার দিলে ভিটামিন, আয়রন ও ক্যালশিয়ামের শোষণ ব্যাহত হয়।
- **মাছ**: মাছ খাওয়ানো উচিত, কিন্তু সামুদ্রিক মাছে বেশি মার্কারি (Mercury) থাকে, সেগুলো খাওয়া উচিত নয়।
- **অল্প সেদ্ধ ডিম**: ৬ মাস বয়সের আগে ডিম দেওয়া উচিত নয়। ৬ মাসের পরে ডিম দিতে গেলে ভালো করে সেদ্ধ করে খাওয়াতে হবে। সেদ্ধ করার পর ডিমের সাদা অংশ ও কুসুম যেন শক্ত হয়।
- **মাংসের মেটে:** এতে বেশি ভিটামিন 'এ' থাকে, যা দীর্ঘদিন খাওয়ালে শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

এবার অন্য দু-একটা বিষয় নিয়ে দু-চার কথা

শিশুরা যেসব তরল পান করতে পারে:

১। **বুকের দুধ**: শিশুর ৪-৬ মাস বয়স পর্যন্ত একমাত্র খাবার।

২। **ফর্মুলা দুধ বা কৌটোর দুধ**: বিস্তৃত আলোচনার জন্য *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৫ সংখ্যা দেখুন। যেসব শিশু বুকের দুধ পায় না, তাদের জন্য বুকের দুধের পরিবর্ত খাবার।

- গোরুর দুধ থেকে তৈরি ফর্মুলা দুধ: সাধারণত আমরা বাজারে যেসব দুধ পাই বা শিশুকে খাওয়ানো হয়, সবই গোরুর দুধ থেকে তৈরি। সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক শিশুকে এক দুধই খাওয়ানো উচিত। ৬ মাস বয়সের পরে একই ধরনের ফলো-আপ বা পরবর্তী পর্যায়ের দুধ চলবে। গোরুর দুধে অ্যালার্জি থাকলে শিশু পাতলা পায়খানা করবে, গ্যাস হবে, পেটে ব্যথা হবে ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে অন্য ধরনের দুধ দিতে হবে।
- হাইড্রোলাইজ্ প্রোটিন ফর্মুলা: গোরুর দুধে অ্যালার্জি থাকলে শিশু এই দুধ খেতে পারে।
- সয়া থেকে তৈরি দুধ: গোরুর দুধে অ্যালার্জি থাকলে শিশু এই দুধও খেতে পারে।

৩। **পরবর্তী ধাপের ফর্মুলা দুধ (কৌটোর দুধ)**: ৬ মাস বয়সের পরের খাবার।

৪। **গোরুর দুধ:** শিশুকে স্কিমড বা সেমি-স্কিমড দুধ খাওয়ানো উচিত নয়। হোল মিল্ক খাবে এক বছর বয়সের পরে। সেমি স্কিমড মিল্ক ২ বছরের পরে এবং ১% ফ্যাট মিল্ক ৫ বছরের পরে দেওয়া যায়। তার আগে নয়।

৫। **ফোটানো ঠান্ডা জল:** ৬ মাস বয়সের পরে খাবে। বুকের দুধ খেলে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত জলের প্রয়োজন নেই। ফর্মুলা দুধ খেলে খাওয়ার পর বা মাঝে ফোটানো ঠান্ডা জল খাওয়ানো যায়।

৬। **ফলের রস:** ৬ মাস বয়সের পরে। পাতলা করে, ১ ভাগ রসের সঙ্গে ১০ ভাগ জল মিশিয়ে।

শিশুকে যেসব পানীয় দেওয়া উচিত নয়

১। **শিশুদের জন্য তৈরি কোনো শরবত, আয়ুর্বেদিক পানীয়**: এতে সুগার থাকে, শিশুর নরম সদ্য ওঠা দাঁতের ক্ষতি হয়।

> খাওয়ানোর সময় অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেবেন না। টিভি দেখবেন না, বা কারও সঙ্গে গল্প করবেন না। শিশুর সঙ্গে কথা বলুন, তার দিকে মনোযোগ দিয়ে খাওয়ান।
>
> খাবার খেতে কখনোই শিশুকে জোর করবেন না। নিশ্চয়ই এমন কোনো কারণ আছে যাতে শিশু খেতে চাইছে না।

২। **চিনির শরবত, মিছরির জল, স্কোয়াশ:** একই কারণে এসব খেলে দাঁতের ক্ষতি হয়। খুব পাতলা করে অল্প পরিমাণে কাপে করে একটু-আধটু দেওয়া যেতে পারে।

যেসব পানীয় শিশুকে দেওয়া যাবে না:

১। **কোল্ড ড্রিঙ্কস, লেমোনেড, স্কোয়াশ বা এই জাতীয় পানীয়:** এই জাতীয় পানীয়ের মধ্যে অ্যাসিড থাকে, যা শিশুর দাঁতকে মারাত্মকভাবে ক্ষয় করে। এমনকী 'সুগার ফ্রি' স্কোয়াশেও যেসব কৃত্রিম মিষ্টি দেওয়া থাকে, তাও শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর।

২। **চা ও কফি:** চা ও কফি খাবারের আয়রন শোষণে বাধা দেয়, বেশি চা বা কফি খেলে আয়রনের অভাব ঘটে, অ্যানিমিয়া হতে পারে।

৩। **বোতলের জল (মিনারেল ওয়াটার)**: এতে বেশি পরিমাণ খনিজ লবণ বা মিনারেল থাকে, যা শিশুর উপযুক্ত নয়। কোনো কোনো জলে সোডা জাতীয় অ্যাসিড থাকে, যা শিশুর ক্ষতি করে।

৪। **ভেড়া ও ছাগলের দুধ**: এই দুধে প্রয়োজনীয় ভিটামিন বা খাদ্যগুণ থাকে না, তাই শিশুর অনুপযুক্ত।

নিরামিষ আহার:

সবাই মাছ মাংস খায় না। কোনো কোনো পরিবার নিরামিষাশী। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিশুকেও তারা আমিষ আহার খাওয়াবেন না। তবু তাদের খেয়াল রাখতে হবে, যাতে শিশু সঠিক পুষ্টি পায়। তাদের প্রোটিন, ভিটামিন, আয়রনের অভাব না ঘটে। এক্ষেত্রে—

- গর্ভকালীন অবস্থায় মাকে যথেষ্ট ভিটামিন-বি$_{১২}$ যুক্ত খাবার বা ওষুধ খেতে হবে।
- যেসব শিশুকে মাছ মাংস খাওয়ানো হবে না, তাদের অন্তত দু-বছর ধরে বুকের দুধ বা ফর্মুলা দুধ খাইয়ে যেতে হবে।
- মাছ বা মাংসের পরিবর্তে যেসব খাবার দেওয়া যেতে পারে—

  ১। **কলাই বা ডাল:** মুসুর ডাল, মটর ডাল, ছোলার ডাল সেদ্ধ করে খাওয়ানো যায়।

  ২। তিল ভালো করে বেটে পেস্ট করে অন্য সবজির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়।

  ৩। চীনেবাদাম খুব ভালো করে বেটে মিহি করে দেওয়া যায়। তবে অ্যালার্জি থাকলে দেওয়া যাবে না।

  ৪। সয়া দুধের পনির বা দই দেওয়া যায়। একে ইংরেজিতে বলে 'টফু' (Tofu)।

  ৫। ভিটামিন 'সি' যুক্ত খাবার আয়রন শোষণে সহায়তা করে। টক জাতীয় ভিটামিন 'সি' যুক্ত ফল, সবজি, কমলা লেবুর রস পাতলা করে দেওয়া যায়।

যেসব শিশু খেতে চায় না:

'শিশু খেতে চায় না' এই অভিযোগ প্রায় সব মায়েরই। আগে এসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে সেসব ছোটো শিশুর ক্ষেত্রে। কিন্তু বড়ো শিশুরা খেতে না চাইলে ভাবুন কেন খেতে চাইছে না। কিছু বিকল্প সমাধান চেষ্টা করে দেখতে পারেন—

- শিশুকে প্রধান খাবারের মাঝে বার বার এটা ওটা খেতে দেবেন না। অনেক শিশুই সারাদিন কিছু না কিছু খেতে থাকে, মা-ও তাকে পর পর খাইয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের খিদে ঠিকমতো হয় না, তারা খেতেও চায় না।
- নিয়ম মেনে রুটিন মেনে শিশুকে খাওয়ান। শিশুরা নিয়ম মেনে খেতে পছন্দ করে।
- মুখে অল্প খাবার দিন। বেশি খাবার একসঙ্গে দিলে শিশু খেতে পারে না।
- শিশু একবার না খেতে চাইলে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। দুশ্চিন্তা না করে খাবার সরিয়ে নিন। তখনই বিকল্প কোনো খাবার দেবেন না। পরের খাবার সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন। শিশু একবেলা একটু কম খেলে কোনো ক্ষতি হবে না। অপেক্ষা করে দেখুন।
- কোনো নতুন খাবার শিশু খেতে না চাইলে জোর করবেন না। কিছুদিন পরে আবার সেই খাবার দিয়ে দেখুন।
- খাওয়ানোর সময় অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেবেন না। টিভি দেখবেন না, বা কারও সঙ্গে গল্প করবেন না। শিশুর সঙ্গে কথা বলুন, তার দিকে মনোযোগ দিয়ে খাওয়ান।
- খাবার খেতে কখনোই শিশুকে জোর করবেন না। নিশ্চয়ই এমন কোনো কারণ আছে যাতে শিশু খেতে চাইছে না। হয়তো তার খিদে হয়নি, কিংবা একটু আগেই অন্য কিছু খেয়েছে। খিদে পেলে সে অবশ্যই খাবে।

অতিরিক্ত ভিটামিন বা টনিক খাওয়ানো:

শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন সে দুধ থেকে পায়। ৬ মাস বয়সের পরে অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' লাগে। কৌটোর দুধে তাই ৬ মাস পরের ফর্মুলাতে অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে। যেসব শিশু কমপক্ষে দৈনিক ৫০০ মিলিলিটার ফর্মুলা দুধ খায়, তাদের আর অতিরিক্ত ভিটামিন দেওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু যারা বুকের দুধ খায় বা কম দুধ খায়, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 'এ' ও 'ডি' ভিটামিন দিতে হবে। তবে যেহেতু আমাদের দেশে এসব হিসাব করে খাওয়ানো যায় না বা সম্ভব হয় না, তাই সব শিশুকেই ৬ মাসের পরে অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' খাওয়ানো দরকার। ৬ মাসের পর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' তেল খাওয়ানো হয়, নিয়মিত সেই তেল খাওয়ান।

যেসব শিশু নিরামিষ খায়, তাদের এর সঙ্গে অতিরিক্ত ভিটামিন 'বি$_{১২}$' ও 'বি'$_{২}$' দেওয়া দরকার।

খাদ্য-খাবারের আলোচনা এ পর্যন্ত। অল্প কথায় স্বাভাবিক নিরুদ্বিগ্নভাবে শিশুকে খাওয়ান। জোর করবেন না। ঘরের খাবার খাওয়ান। শিশু আপনার সুস্থ থাকবে, খাবেও। অযথা খাবার নিয়ে টেনশান বাড়াবেন না।

শিশুকে সুস্থ রাখতে সঠিক সময়ে টিকা দিন।

আপনার শিশু সুস্থ থাকুক।

লেখক পরিচিতি: ডা. স্বপন বিশ্বাস, এমবিবিএস ডিসিএইচ, এমডি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ একটা সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

অপ্রয়োজনীয় ওষুধ

মাল্টিভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং আরও পাঁচরকম

মাল্টিভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট তার সঙ্গে ক্যালশিয়াম আয়রন অ্যামাইনো অ্যাসিড—এরকম সাত-পাঁচ জিনিস মিশিয়ে তৈরি করা বড়ি বা আরও দামি টনিক-সিরাপ খেয়ে কী উপকার হয়? আদৌ উপকার হয় কি? নাকি পকেট ফাঁকা হয়, হয় অপকার? লিখছেন— **ডা. অর্ক বৈরাগ্য**।

ছোটোবেলায় জীবন বিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি আমাদের দেহের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় ভিটামিন ও মিনারেল (খনিজ লবণের) ভূমিকা। সেখানে লেখা থাকত, সঙ্গে থাকত ছবি, কোন কোন ভিটামিন কোন কোন খাবারে পাওয়া যায়। যেমন ভিটামিন 'এ'- পাকা পেঁপে, গাজরে থাকে। ভিটামিন 'সি' থাকে লেবু, আমলকিতে। সেই বইগুলো অনেক খুঁজেও পেলাম না। কোথাও লেখা আছে ভিটামিনগুলো ভিটামিন সিরাপ বা ট্যাবলেট-এ পাওয়া যায়। একইভাবে আরেকটু ভাবতেই মনে পড়ল, ভিটামিন 'এ'-র অভাবে রাতকানা রোগ হয় এমনকী অন্ধত্বও হতে পারে সময়মতো চিকিৎসার অভাবে। 'সি'-এর অভাবে হয় স্কার্ভি আর 'ডি'-এর অভাবে বাচ্চাদের রিকেট। অথচ আমাদের এই ধরনের কোনো রোগের লক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রায়শই ভিটামিন বড়ি বা সিরাপ খেয়ে থাকি; আচ্ছা ব্যথা না হলেও কি আপনি ব্যথার ওষুধ খান? ভিটামিনের ক্ষেত্রে আমরা সেটা ভেবে দেখব না কেন?

জন্ডিস হল, আপনার ডাক্তার আপনাকে বললেন স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করুন। 'খিদে ফিরলে সব খান'। কিন্তু আপনি তখন সব ছেড়ে সকাল সন্ধ্যে আখের রস, সব সেদ্ধ খাবার, তেতো পাতার রস খাওয়া শুরু করলেন, অথচ যেই শরীরটা একটু দুর্বল লাগছে, পাশের বাড়িতে বা ডাক্তারখানায় প্রেশার মাপতে গিয়ে কম পেলেন (লো-প্রেশার) সেদিনই একখানা ভিটামিন সিরাপ কিনে নিয়ে চলে এলেন। তখন কোথায় গেল পাকা পেঁপে, গাজর, শাকসবজি!

আসলে এই স্ববিরোধিতাটা আমাদের ইচ্ছাকৃতও নয় সব সময়; টিভি-রেডিওতে বিজ্ঞাপন, আপনার পছন্দের অভিনেতা-অভিনেত্রীর গলায় এই সমস্ত দ্রব্যের হাতেনাতে ফল পাওয়ার গল্প (যাকে বলে আষাঢ়ে গল্প) কখনো কখনো ডাক্তারবাবুদেরও কিছু একটা না দিলেই নয়, বা দিলে তো ক্ষতি নেই এই ধরনের মানসিকতায় লেখা ভিটামিন সিরাপের প্রেসক্রিপশন—এই সবই আপনাকে ভুলিয়ে দেয় ছোটোবেলার জীবন বিজ্ঞানের পাঠ।

প্রথমেই দু-টো কথা বলে নেওয়া জরুরি। প্রথমত আপনার বাজারপ্রবণ মনের থেকে আপনার শরীর অনেক বেশি যুক্তিশীল এবং নিজের ভালোটা নিজে ভালোই বোঝে।

দ্বিতীয়ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাবিজ্ঞানে কোন ওষুধ কীভাবে কাজ করে, আদৌ কোনো কাজ বা উপকার করে কি না বা কোনো ক্ষতি করে কিনা, সেসব তথ্য একাধিক 'ট্রায়াল' বা 'স্টাডি' করার মাধ্যমেই একমাত্র জানা যায়, যে বস্তু ওষুধ নিয়ে একটা সন্তোষজনক 'স্টাডি' করা নেই, সেটা শরীরে না পাঠানোটাই যুক্তিসম্মত নয় কি? এর প্রাসঙ্গিকতা আমরা পরে দেখব।

আমাদের এই শরীরে মূলত ছয় রকম খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন। এদের মধ্যে তিন রকম আমাদের শরীরে শক্তির জোগান দেয়; এরা হল— শর্করা, প্রোটিন আর ফ্যাট, আর বাকি তিন রকম দেহ গঠন ও অন্যান্য বিপাক ক্রিয়ায় অংশ নেয়; এরা হল ভিটামিন, খনিজলবণ আর জল।

> শর্করা, প্রোটিন আর ফ্যাট, আর বাকি তিন রকম দেহ গঠন ও অন্যান্য বিপাক ক্রিয়ায় অংশ নেয়; এরা হল ভিটামিন, খনিজলবণ আর জল।

শাকাহারী বা আমিষভোজী নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন খাবারে এই ছয় রকমেরই বস্তু পেয়ে যাই। কেবলমাত্র যারা কঠোর শাকাহারী তাদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে কয়েকটা ভিটামিনের অভাব লক্ষ করা গেছে, এরা সংখ্যায় বেশ কম। বেশ কিছু ধরনের ডাল, দুধ এগুলো থেকে সাধারণ শাকাহারীরা প্রোটিনের চাহিদা মিটিয়ে নেন।

এবার আসি আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ভিটামিন ও খনিজ লবণ প্রসঙ্গে। ভিটামিনগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, তেল বা ফ্যাটে দ্রাব্য (এ, ডি, ই কে / A,D,E,K) আর জলে দ্রাব্য (বি কমপ্লেক্স অর্থাৎ B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, B_{12} ও Vitamin C); এখন প্রশ্ন হল এই দ্রাব্যতার বিষয়টা আসছে কেন? আমরা তো আর ভিটামিনগুলোকে জলে বা তেলে গুলে দেখতে যাচ্ছি না। তবু ব্যাপারটা ভাবতে হচ্ছে কেননা খুব সহজ করে বলতে গেলে তেল হল আমাদের শরীরের কোষকলাগুলো আর জল হল শরীরে যে ৭০-৮০ শতাংশ জল থাকে যা সারা দেহে সংবাহিত

হয় আর প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তা হলে বোঝাই যাচ্ছে ফ্যাটে দ্রাব্য ভিটামিনগুলো এমনিতেই আমাদের শরীরে ক্রমশ জমতে থাকে এবং একটা আড়ত / 'স্টোর' তৈরি করে। অপরপক্ষে জলে দ্রাব্যগুলো প্রায় দৈনন্দিন কোনো-না-কোনোভাবে শরীরে প্রবেশ করে, যেটুকু শরীরে দরকার শরীর সেটাকে কাজে লাগায় আর বাকিটা বেরিয়ে যায় প্রস্রাব, পায়খানা বা ঘামের মাধ্যমে। ফলে দুই ক্ষেত্রেই আলাদা করে মাল্টিভিটামিন সিরাপের প্রয়োজনীয়তা আর কার্যকারিতাটা আদৌ কতটা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের শরীরে প্রায় পঞ্চাশ রকম খনিজ মৌল পাওয়া গেছে। তারা বৃদ্ধি, বিপাক আর কোষের মেরামতিতে কাজে লাগে। মূলত তিন ভাগে বিভক্ত এরা—(ক) মুখ্য খনিজ—এরা হল ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম আর ফসফরাস (খ) গৌণ খনিজ—এরা দৈনিক এক মিলিগ্রামেরও কম প্রয়োজনীয় হয়—লোহা (Fe), আয়োডিন, ফ্লুয়োরিন, জিঙ্ক, কপার ইত্যাদি আর (গ) গৌণ খনিজ যাদের কোনো কার্যকারিতা এখনও জানা যায়নি কিন্তু শরীরে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। এরা হল—সিসা, পারদ, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।

বিভিন্ন দৈনন্দিন খাবারের নমুনা পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে এই সমস্ত খনিজ মৌলগুলো দৈনন্দিন খাবারে এতটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে যে আলাদা করে সেগুলোকে সেবন করা একেবারেই অর্থহীন। যেমন খাবার লবণে সোডিয়াম, ক্লোরিন, আয়োডিন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। দুধে যা ক্যালশিয়াম থাকে (এক লিটারে) তা প্রায় আড়াইটি ক্যালশিয়াম বড়ির সমান এবং শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণ। মাছ, মাংস, ডিম তথা সবুজপাতাওয়ালা শাকসবজিতে, বাদামে ও ছোলা, মটরে থাকা আয়রনের পরিমাণ আমাদের দৈনন্দিন চাহিদাকে অনায়াসে মিটিয়ে দেয়।

এবার সেই জীবন বিজ্ঞানের পাতা উলটে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক ভিটামিনগুলো কোথা থেকে পাওয়া যায়। আর কী কী রোগ হতে পারে এদের অভাবে।

● **ভিটামিন-'A'**: দুধ, মাছ, মাংস, ডিম সমস্ত সবুজপাতাওয়ালা শাক, পেঁপে, আম, গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'A' থাকে। এর দৈনন্দিন খাবারে অনুমোদিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ (Recommended Dietary Allowance) হল 4000 I.U. (I.U. কথাটার মানে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট)। গর্ভবতী মা, স্তনদাত্রী মা আর বৃদ্ধির মুখে থাকা বাচ্চাদের এই চাহিদা কিছুটা বেশি। ভিটামিন 'A'-এর অভাবে রাতকানা রোগ থেকে শুরু করে চোখের মণিতে ঘা হয়ে অন্ধত্বপ্রাপ্তি আমাদের দেশের পাঁচ বছরের নীচের বাচ্চাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্যসমস্যা। তাই এই বয়সি বাচ্চাদের প্রতি ছ-মাসে ভিটামিন 'A'-এর তেল অন্য টিকা দেওয়ার সঙ্গে মুখে খাওয়ানো হয়। এটি এদের জন্য দরকার। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে এই টিকাকরণ বেশিরভাগ সময়ই অনিয়মিত হচ্ছে বা বন্ধ থাকছে। এদিকে বাজারে ভিটামিন সিরাপ রমরমিয়ে বিক্রি হয়ে চলেছে আর ১৫ থেকে ৫০ সব বাচ্চারাই তা সেবন করছে।

● **ভিটামিন- 'D'**: এর বিশেষত্ব হল এটা খাবারেও থাকে এবং আমাদের শরীরেও যথেষ্ট পরিমাণ তৈরি হয়। যেকোনো প্রাণীজ খাবারেই ভিটামিন 'D' থাকে - মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মায়ের বুকের দুধেও পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন 'D' থাকে। ভারতের মতো দেশে পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের ভিটামিন-'D'-এর অভাবে 'রিকেট' রোগ দেখা যায়, যা মূলত অপুষ্টির কারণেই হয়; এ ছাড়া দিনের পর্যাপ্ত সময় সূর্যালোক না পাওয়াও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মহিলাদের বিশেষত গর্ভাবস্থায় এবং শিশুকে দুধ দেওয়ার সময় এর অভাব দেখা যায়।

● **ভিটামিন- 'E'**: বিভিন্ন রকম উদ্ভিজ্জ তেল, ডিমের কুসুম ও মাখনে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'E' থাকে। ৮-১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'E' দৈনন্দিন প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবং স্বস্তিদায়কও বটে যে আমাদের শরীরে ভিটামিন 'E'-র অভাব একেবারেই হয় না বললেই চলে; দৈনন্দিন খাবারে এর প্রয়োজন উল্লেখযোগ্যভাবে মিটে যায়।

● **ভিটামিন 'K'**: এটির বিশেষত্ব হল যেমন এটি খাবারে পাওয়া যায়—যেমন গাঢ় সবুজ পাতাওয়ালা শাকসবজি, গোরুর দুধ—তেমনই আমাদের অন্ত্রের এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া এই ভিটামিন সংশ্লেষ করে এবং আমাদের শরীরে জোগান দেয়। দেখা গেছে এক সপ্তাহের বেশি দৈনন্দিন অ্যান্টিবায়োটিক খেলে তা এই ব্যাকটিরিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ফলে দেহে ভিটামিন 'K'-এর পরিমাণ কমে। ভিটামিন 'K' মূলত শরীরে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্যকারী ফ্যাক্টর তৈরি করে এবং এর অভাবে রক্ত জমাট বাঁধতে দেরি হয়। এখানে উল্লেখ্য সরকারি হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি জায়গায় জন্মের পরেই সমস্ত শিশুকে ভিটামিন 'K' 'প্রোফাইল্যাক্সিস' (রোগ-নিবারক হিসেবে) দেওয়া হয়।

● **ভিটামিন-'B_1'**: চাল, গম, ছোলা, মটর, বাদাম, মাছ, ডিম-এ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। মায়ের দুধে বাচ্চারা পর্যাপ্ত 'B_1' পেয়ে থাকে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চালের খোসায় যে ভিটামিন 'B_1' থাকে তা বেশি পালিশ করতে গিয়ে হারিয়ে যায়, ফলত বেশি পালিশ করা চালে 'B_1'-এর পরিমাণ কম থাকে। এটির অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়। শরীরে ৩০ মিলিগ্রাম 'B_1' থাকে। এর থেকে বেশি শরীরে জোগান দিলে তা মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। যারা অনেকদিন অভুক্ত থাকে, মদ্যপান করে ও যাদের ডায়ালিসিস করা হয় তাদের শরীরে এই ভিটামিন কমে যায় ও তাদের এই ভিটামিন বাইরে থেকে দেওয়ার দরকার পড়ে।

● **ভিটামিন-'B_2'**: দুধ, ডিম, সবুজপাতাওয়ালা শাকসবজিতে থাকে। চালে এর পরিমাণ খুব কম থাকে। ফলে যাদের প্রধান খাদ্য ভাত সেই জনগোষ্ঠীতে এর অভাব লক্ষ করা যায়। দৈনন্দিন প্রয়োজন ১-১.২ মিলিগ্রাম। এর অভাবে ঠোঁট ও জিভে ঘা হয়।

● **ভিটামিন-'B_3'** (নিয়াসিন): পশুর যকৃৎ, মাংস, মাছ শিমজাতীয় সবজি ও বাদামে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। এর অভাবে পেলেগ্রা হয় যাতে ডায়ারিয়া, চামড়ার প্রদাহ ও মানসিক বিকার (ডিমেনশিয়া) দেখা যায়। এই ভিটামিন দেওয়া মাত্রই এইসব রোগ কিছুদিনে সম্পূর্ণ সেরে যায়।

● **ভিটামিন-'B_5'** (প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড): মাছ, ডিম, মাংস সবুজ শাকসবজি প্রায় সব খাবারেই থাকে এই ভিটামিন। দৈনিক চাহিদা ১০ মিলিগ্রাম। প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় ৩ মিলিগ্রাম।

● **ভিটামিন-'B_6'** (পাইরিডক্সিন): দুধ, ডিমের কুসুম, মাছ, শিমজাতীয় সবজি ইত্যাদিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। এর অভাবে পেরিফেরাল নিউরাইটিস হতে পারে। দৈনন্দিন লাগে ২ মিলিগ্রাম।

● **ভিটামিন-'B_{12}'**: এর উৎস হল মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, চিজ। উদ্ভিজ্জ কোনো খাদ্যে 'B_{12}' থাকে না। এটি অন্ত্রে ব্যাকটিরিয়ার দ্বারাও সংশ্লেষিত হয় ভিটামিন 'K'-এর মতো। মূলত লিভারে সঞ্চিত থাকে। মনে করে দেখুন এটি জলে দ্রাব্য একমাত্র ভিটামিন যা দেহে সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চয় থেকে দেহে চট করে এই ভিটামিনের অভাব হয় না। এবং কোনো রকম খাদ্যে এটা গ্রহণ না করলেও ওই রিজার্ভ থেকে ১-৩ বছর দিব্যি চলে যায় আমাদের। পাকস্থলীর একরকম 'শোষণে অক্ষম' অবস্থায় ভিটামিন 'B_{12}' - এর অভাব দেখা যায়, এর অভাবে পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া হয়। দৈনিক চাহিদা ১-১.৫ মিলিগ্রাম।

● **ফোলিক অ্যাসিড:** মাংস, দুগ্ধজাত খাবার, ডিম, ফল ও দানাশস্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। মূলত খাদ্যে কোলেটের অভাবের জন্য শরীরে এর অভাব লক্ষ করা যায়। গর্ভাবস্থায় ও স্তনদানের সময় এর অভাব হতে পারে। গর্ভাবস্থায় মায়েদের ফোলিক অ্যাসিড দিলে কম ওজন নিয়ে জন্মানো শিশুর সম্ভাবনা কমে। আমাদের দেশে সরকারি প্রকল্প অনুযায়ী গর্ভাবস্থায় মায়েদের আয়রন ও ফোলিক অ্যাসিড খাওয়ানো হয়। এর অভাবে মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয়। দৈনিক চাহিদা ২০০-৩০০ মাইক্রোগ্রাম (এক মাইক্রোগ্রাম হল এক মিলিগ্রামের হাজার ভাগের একভাগ)।

● **ভিটামিন 'C':** টাটকা ফল, সবুজপাতাওয়ালা শাকসবজি, পেয়ারা, লেবু, ছোলা, বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'C' থাকে। দৈনিক চাহিদা ৪০ মিলিগ্রাম। একটা ১০০ গ্রাম সাইজের পেয়ারাতে ভিটামিন 'C থাকে ২১২ মিলিগ্রাম। ভিটামিন 'C'-এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। এতে মাঢ়ী ফোলে, রক্ত পড়ে, ত্বকের নীচে রক্তের দাগ জমে কালশিটে পড়তে পারে, কোনো ক্ষতস্থান সারতে দেরি হতে পারে ইত্যাদি।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক খনিজ পদার্থগুলোর গুরুত্ব

আয়রন বা লোহা (Fe) : পশুর যকৃৎ, মাংস, মাছে প্রচুর লোহা থাকে, দুধে লোহা কম পরিমাণে থাকে। এ ছাড়া শিমজাতীয় সবজি, বাদাম, সবুজপাতাওয়ালা সবজিতে যথেষ্ট লোহা পাওয়া যায়। ভিটামিন 'C'-এর উপস্থিতিতে লোহার শোষণ শরীরে বেশি হয়। এখানে একটা ছোট্ট জিনিস জেনে নেওয়া ভালো। আমাদের অন্ত্রে যখনই খাবারের সঙ্গে লোহা যায়, সেটা অন্ত্রের ঝিল্লির কোষগুলোতে প্রথমে জমা হয়, শরীরে যখন যখন ওই লোহার প্রয়োজন পড়ে অন্ত্রের ঝিল্লির কোষ তার সরবরাহ করে, ফলত বেশি বেশি আয়রন খেলেও অন্ত্রের ঝিল্লিতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে লোহা আগে থেকেই সঞ্চিত থাকে তাহলে কোনোভাবেই ওই আয়রন শরীরে শোষিত হবে না, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। ঠিক একই কারণে রক্তাল্পতায় চিকিৎসায় রক্তে হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে এলেও পরবর্তী তিনমাস আয়রন ট্যাবলেট খেতে বলা হয়, যাতে অন্ত্রের ঝিল্লি কোষের ওই 'রিজার্ভ' আবার পূর্ণ হয়ে যায়। দৈনিক চাহিদা পুরুষদের ১ মিলিগ্রামের একটু কম (০.৮৪ মিলিগ্রাম) মহিলা যারা গর্ভবতী নন - ১.৬৫ মিলিগ্রাম, গর্ভবতী মা ২.৮০ মিলিগ্রাম, শিশুদের ০.৪৫-০.৭৭ মিলিগ্রাম।

ক্যালশিয়াম (Ca): দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যে, ডিম, মাছ, সবুজ পাতাওয়ালা শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম থাকে। দৈনিক চাহিদা ৬০০-৮০০ মিলিগ্রাম। দেখা গেছে দিনে ১.৫ থেকে ২ লিটার জল (?) খেলে ১৫০-২০০ মিলিগ্রাম ক্যালশিয়াম পাওয়া যায়। ভিটামিন 'D' ক্যালশিয়ামের শোষণে সহায়তা করে। এটা প্রমাণ করা গেছে যে যদি শরীরে ভিটামিন 'C'-এর পরিমাণ যথেষ্ট থাকে তা হলে কম ক্যালশিয়াম থাকলেও শরীরে অসুবিধা হয় না। রিকেট বা অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয় না। মহিলাদের অস্টিওপোরোসিস রোগে হাড় ভেঙে গেলে, বাড়ন্ত বাচ্চাদের, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের অনেক সময় ক্যালশিয়াম বড়ি একমাত্র বা ভিটামিন 'D' -এর সঙ্গে দেওয়া হলেও বিভিন্ন স্টাডি বা ট্রায়ালে এর বাস্তবিক কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে।

খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালশিয়াম থাকলে (আগেই দেখেছি, যথেষ্ট থাকেও বটে) ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্টস খাওয়া অবৈজ্ঞানিক ও ব্যয়বহুল পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়।

জিঙ্ক বা দস্তা (Zn): মাছ, দুধ, মাংস, সবুজপাতাওয়ালা শাক ইত্যাদিতে জিঙ্ক পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। দৈনিক চাহিদা ১০-১২ মিলিগ্রাম। জিঙ্কের অভাবে বৃদ্ধির ঘাটতি ও ক্ষত নিরাময়ে দেরি হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য ডায়ারিয়াতে মুখে খাবার জলীয় দ্রবণ বা ও আর এস (ORS)-এর সঙ্গে জিঙ্ক দিলে ডায়ারিয়ার তীব্রতা ও রোগকাল দুইই কমে যায়।

তাহলে আমরা দেখলাম বেশির ভাগ ভিটামিনই আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। যাদের মোটামুটি খাবার জোটে তাদের দেহে ভিটামিনের অভাব হওয়াটাও খুব স্বাভাবিক নয়। আর একবার অভাব হলেও তার থেকে হওয়া রোগগুলোর স্পষ্ট রোগলক্ষণ ও উপসর্গ থাকে; শুধু দুর্বল লাগা, ঘুম পাওয়া, রোগা হয়ে যাওয়া, খিদে না হওয়া ভিটামিনের অভাবের প্রমাণ নয়। অথচ এইগুলো হচ্ছে দেখেই আপনি ভিটামিন সিরাপ বা ট্যাবলেটটি কেনেন।

আমাদের ধারণাই হল ভিটামিন বুঝি শরীরে শক্তি জোগায়। প্রথমেই বলেছিলাম শরীরে শক্তি দেয় শর্করা প্রোটিন আর ফ্যাট, ভিটামিন কোনোভাবেই নয়। আমরা ভাবি ভিটামিন বুঝি ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু ভুললে চলবে না ফ্যাটে দ্রাব্য ভিটামিন আমাদের শরীরে জমতে থাকে এবং দৈনিকভাবে তাদের অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করে মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, বমি, খিদে না হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। আমরা এটাও জানলাম সমস্ত রোগেই ভিটামিনের অভাব হয় না এবং খাদ্যে ভিটামিন থাকে যথেষ্ট পরিমাণে এবং ভিটামিনের অভাবে রক্তচাপও কমে না। এ ছাড়া যেখানে আলাদা করে নির্দিষ্ট ভিটামিন বা খনিজ দরকার, যেমন গর্ভাবস্থায় আয়রন ও ফোলিক অ্যাসিড, জন্মের পরপরই ভিটামিন 'K', বাচ্চাদের ভিটামিন 'A' এগুলো জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়ার কথা। যখন তখন ভিটামিনের দরকার নেই।

মাল্টিভিটামিন সিরাপগুলিতে ওপরে বলা ভিটামিন আর খনিজ মৌলগুলো ছাড়াও কিছু জিনিস থাকে। যেমন কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেগুলো পেটে যাওয়া মাত্র পেটের অম্ল পরিবেশে ধ্বংস হয়ে যায়। এ ছাড়া থাকে 'লাইকোপেন' নামক একটি যৌগ। এটা টম্যাটোতে থাকে। কোনো খাবারকে লাল রং করতে এটি ব্যবহার হয়; কেউ কেউ এটাকে পুরুষদের প্রস্ট্রেট ক্যানসারের প্রতিরোধ হিসাবে দাবি করলেও তা সুপ্রমাণিত নয় ও আমেরিকার FDA (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যারা আমেরিকাতে ওষুধ ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক সংস্থা) এটাকে ওষুধ হিসাবে নিষিদ্ধ করেছে।

এই ভিটামিন 'C' লাইকোপেন ও সেলেনিয়াম জাতীয় আরও কয়েকটা

যৌগকে এক গালভারী 'অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট' নাম দেওয়া হয়েছে ও দাবি করা হয় এরা সর্দিকাশি থেকে শুরু করে ক্যানসার সমস্ত রোগ প্রতিরোধ করে ও বাজারে পাওয়া অধিকাংশ ভিটামিন সিরাপ ট্যাবলেট-এ এদের দেখা মেলে। প্রথমেই যেটা ভুললে চলবে না 'অক্সিড্যান্ট' নানা জিনিস আমাদের শরীরে বিপাক ক্রিয়ায় তৈরি হয় বটে, তবে শরীরের মধ্যেই অসংখ্য উৎসেচক (Enzyme) প্রতিমুহূর্তে নিরলসভাবে তাদেরকে প্রশমিত করে চলেছে—'অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট' আমাদের শরীরেই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। বেশ কিছু স্টাডিতে দেখানো গেছে ভিটামিন 'E', ভিটামিন 'C' এবং অন্যান্য যাদের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট বলা হচ্ছে তারা কেউই হৃদ-রক্তসংবাহী রোগে (অর্থাৎ যে রোগে বুকে ব্যথা ও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে) বা ক্যানসার প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বরং দীর্ঘদিন মাত্রাতিরিক্ত হারে ভিটামিন 'E' খেয়ে হার্টফেলিওর বা ভিটামিন 'A'-এর প্রভাবে মাসিক শেষ হওয়া মহিলাদের কোমরের হাড় ভাঙার ঘটনা ঘটছে। ফলে এই সমস্ত রোগ প্রতিরোধে প্রতিদিন সুষম খাদ্য গ্রহণ করা, ফল ও শাকসবজি খাওয়া, দৈনিক ব্যায়াম ও কায়িক পরিশ্রম করা, ওজন কমানো, ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা—এগুলোর বিকল্প কিছু নেই। নেই কোনো সহজ রাস্তা। পরিশেষে এরপর যখনই সুযোগ পাবেন একবার মাল্টিভিটামিন সিরাপের প্যাকেটটা নিয়ে মিলিয়ে দেখবেন তাতে কী কী আছে আর কতটা পরিমাণে আছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর নিজেই পেয়ে যাবেন। ক্লাস সেভেনের জীবন বিজ্ঞানের পাঠটা শুধু যদি একটু আমাদের মনে থাকত . . .।

ফল ও শাকসবজি খাওয়া, দৈনিক ব্যায়াম ও কায়িক পরিশ্রম করা, ওজন কমানো, ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা—এগুলোর বিকল্প কিছু নেই। নেই কোনো সহজ রাস্তা। পরিশেষে এরপর যখনই সুযোগ পাবেন একবার মাল্টিভিটামিন সিরাপের প্যাকেটটা নিয়ে মিলিয়ে দেখবেন তাতে কী কী আছে আর কতটা পরিমাণে আছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর নিজেই পেয়ে যাবেন।

বাজারে পাওয়া যায় একটি মাল্টিভিটামিন সিরাপ RIV কোম্পানি - AT এতে যা থাকে (১০ মিলিতে) (দিনে দু-চামচ খেলে)		আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা (যা খাবারেই পাওয়া যায়)
ভিটামিন 'A'	2500 I.U.	4000 I.U.
ভিটামিন 'E'	5 I.U.	10 I.U.
জিঙ্ক	44.4 mg.	12 mg.
নিকোটিনামাইড	15 mg.	20 mg.
এল-লাইসিন	10 mg.	লাগে না, তা ছাড়া পাকস্থলীতে ধ্বংস হয়ে যায়।
ডি-প্যান্থেনল	2.5 mg.	10 mg. প্রস্রাবের সঙ্গেই ৩ মিলিগ্রাম বেরিয়ে যায়।
থাইমিন	1.5 mg.	1.5 mg.
রাইবোফ্লাভিন	1.5 mg.	1.7 mg.
কপার	200 মাইক্রোগ্রাম	2 mg.
পটাশিয়াম আয়োডাইড	100 মাইক্রোগ্রাম	বেশি কিছু জানা যায়নি (মূল লেখা দেখুন)
সেলেনিয়াম	20 মাইক্রোগ্রাম	
ভিটামিন B_{12}	1 মাইক্রোগ্রাম	২ মাইক্রোগ্রাম
ভিটামিন D	200 I.U.	200 I.U.

সূত্র: ইন্টারনেট ও পার্ক টেক্সটবুক অফ কমিউনিটি মেডিসিন।

লেখক পরিচিতি: ডা. অর্ক বৈরাগ্য, এমবিবিএস, একটা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত।

চোখের পাতায় হলুদাভ দাগ বা পীত অক্ষি পল্লব

চোখের পাতায় হলুদাভ দাগ খুবই সাধারণ ঘটনা, আর অনেকেই মনে করেন এটা হল রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ার লক্ষণ। আসলে ব্যাপারটা কী, তা জানাচ্ছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

চোখের কোণে, চোখের পাতার উপরে নীচে হালকা হলুদ রঙের ছোপ বা গুটি প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। অবাঞ্ছিত কোনো কিছুই মুখের সৌন্দর্যকে কিছুটা ব্যাহত করে বই কী! আর সত্যি কথা বলতে কি বেশির ভাগ রোগীই আমাদের কাছে আসেন এই প্রশ্ন নিয়ে—কীভাবে এই দাগটা তোলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সবার শেষে আসব তার আগে জানতে হবে এই হলুদ ছোপ বা গুটি ব্যাপারটা আসলে কী এবং এর পেছনে কোনো গুরুতর শারীরিক সমস্যা লুকিয়ে আছে কি না!

পরিভাষায় এই সামান্য উঁচু হলুদ দাগের নাম Xanthelasma বা Xanthelasma palpabrae যার আক্ষরিক বাংলা প্রতিশব্দ 'পীত-অক্ষিপল্লব'! যাক গে, অত কঠিন কঠিন নামে দরকার কী! বিষয়টা তো আগে বোঝা যাক।

মানুষের রক্তে নানারকম চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকে যেমন— কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, HDL বা বেশি ঘনত্বযুক্ত লাইপোপ্রোটিন LDL বা কম ঘনত্বযুক্ত লাইপোপ্রোটিন, VLDL বা অতি কম ঘনত্বযুক্ত লাইপোপ্রোটিন। এই চর্বিজাতীয় পদার্থগুলোই ধমনীর দেয়ালে জমে জমে হৃৎপিণ্ড ও রক্ত সঞ্চালনজনিত অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। হার্ট অ্যাটাক হাই ব্লাডপ্রেশারের সঙ্গেও এগুলোর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

> সবচেয়ে প্রাথমিক ও জরুরি চিকিৎসা হল খাদ্যাভ্যাস বদলানো ও (অ্যারোবিক্স) ব্যায়াম।

এই চর্বিজাতীয় পদার্থের মাত্রা রক্তে বেড়ে গেলে চামড়াতেও অনেক সময় তার প্রভাব পড়ে। বেশি মাত্রায় চর্বিজাতীয় পদার্থজনিত রোগের অনেকগুলো ধরন আছে। এর ফলে কখনো চামড়ায় গুটির আকারে বা পেশির কন্ডরাতে উঁচু হলুদ ঢিপির আকারে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমতে দেখা যায়। কখনো-বা পুরো চামড়াটাই হলুদ হয়ে যায় কোনো কোনো জায়গায়। কিন্তু এইসব সমস্যাগুলোই খুব বিরল। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পীত অক্ষিপল্লব— প্রথমে আমরা যা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্যায় ভুগছেন যাঁরা তাদের কিন্তু রক্তে চর্বিজাতীয় পদার্থের মাত্রা স্বাভাবিকই থাকে। তবু হার্ট-ধমনী বলে কথা! চোখের কোণে হলুদ চর্বি জমতে দেখলেই কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড এসব ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নেওয়াই ভালো। এই হলুদ গুটিগুলো নরম, বিভিন্ন আকৃতির হয়, সাধারণত চোখের ভেতরের নাকের দিকে পাতার উপরে দেখা যায়—উপর-নীচ উভয় পাতা, কখনো বাইরের দিকেও দেখা যায়। এই গুটিগুলো আসলে কী? এগুলো চামড়ার নীচে চর্বি খেয়ে ফুলে যাওয়া কতগুলো মহাখাদক কোষের স্তূপ। রক্তে চর্বিজাতীয় পদার্থের মাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও অনেক সময় শরীরের ওই সব জায়গায় চামড়ার নীচে ঠিক ওই জায়গায় বিপাক প্রক্রিয়ার গণ্ডগোলের জন্য মহাখাদক কোষে চর্বি জমে থাকে। আবার রক্তে চর্বির মাত্রা বেশি থাকলে এমন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এবার সেই প্রথম প্রশ্নটার উত্তর—কমবে কী করে?

অনেকগুলো চিকিৎসা পদ্ধতি আছে—লেসার, কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া, ইলেকট্রোসার্জারি, ট্রাইক্লোরো অ্যামিটিক অ্যাসিড বুলিয়ে দেওয়া। খরচ সব চেয়ে বেশি অবশ্যই লেসার চিকিৎসায়, কিন্তু পদ্ধতিটা ভালোই। এবার রোগীর সঙ্গে আলোচনা করে সব পদ্ধতি তাকে বুঝিয়ে রোগী-ডাক্তার দু-জনে মিলেই ঠিক করা উচিত কোন পদ্ধতিতে দাগটা 'ভ্যানিশ' করা যাবে। তার সঙ্গে এটাও রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে, দাগটা রেখে দিলে তেমন ক্ষতি কিছু নেই। অনেক রোগী ভাবেন, চামড়ার দাগটা ভ্যানিশ করতে পারলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে সেটা একান্তই ভিত্তিহীন।

যে পদ্ধতিতেই চিকিৎসা করা হোক না কেন, হলুদ দাগটা কিছুদিন পরে ফিরে আসতে পারে।

আর যদি রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায় রক্তে কোলেস্টেরল ইত্যাদি চর্বিজাতীয় জিনিস বেশি আছে, তবে চোখের দাগের চিকিৎসা করুন বা না করুন, রক্তে চর্বি বাড়ার চিকিৎসা কিন্তু করতেই হবে—সবচেয়ে প্রাথমিক ও জরুরি চিকিৎসা হল খাদ্যাভ্যাস বদলানো ও (অ্যারোবিক্স) ব্যায়াম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তে চর্বি কমানোর ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ মতো খেতে হবে।

লেখক পরিচিতি: ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এমবিবিএস, ডিভিডি। একটা সরকারি হাসপাতালে চর্মরোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

সন্দেহবাতিক রোগ: উপসর্গ ও চিকিৎসা

(Delusional Disorder: Symptoms and Treatment)

অঞ্জন এক মহা সমস্যায় পড়েছে। তার মনে হয় রাস্তার লোক বা পাড়ার লোক কিংবা অফিসের সহকর্মীরা সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে আর তারা যেকোনো সময়ে তার ক্ষতি করে দিতে পারে। ক্রমশই পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে উঠল যে ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোনো সে বন্ধ করে দিল। এমতাবস্থায় অঞ্জনের বাবা বাধ্য হলেন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর পরামর্শ নিতে। শুধু অঞ্জন কেন এমন বিভিন্ন ধরনের সন্দেহবাতিক উপসর্গে ভুগছেন অনেক মানুষ। এই সন্দেহবাতিক রোগটা কী, তার উপসর্গগুলো ঠিক কী কী এবং এই বিশেষ মনোরোগের চিকিৎসাই বা কী বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছেন—**রুমঝুম ভট্টাচার্য**।

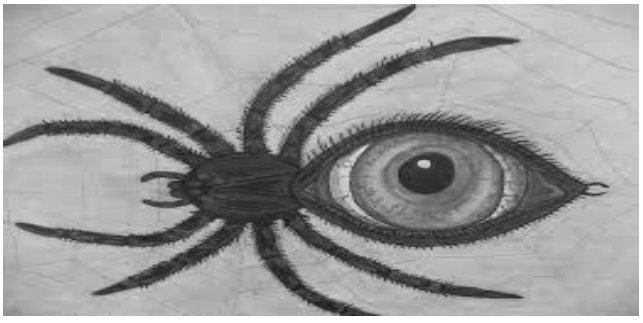

সন্দেহবাতিক রোগ সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা শুরু করার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যত ধরনের মনোরোগ আছে তাকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত দুই ভাগে ভাগ করা হত—নিউরোটিক ডিসঅর্ডারস্ (Neurotic Disorders) এবং সাইকোটিক ডিসঅর্ডারস্ (Psychotic Disorders)। নিউরোটিক মনের অসুখে রোগীর জ্ঞানবুদ্ধি বা বিচারক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় না এবং সে বুঝতে পারে তার মানসিক সমস্যা আছে; কিন্তু সে তা বুঝেও নিজের অস্বাভাবিক ভাবনা বা আচরণ বদলাতে পারে না, তার প্রাত্যহিক জীবন এই সমস্যার কারণে প্রভাবিত হয়। আর সাইকোটিক অসুখে রোগীর জ্ঞানবুদ্ধি (Cognition) বিচারক্ষমতা (Judgement) মানসিক সমস্যার কারণে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে পড়ে, উপরন্তু সে তার বর্তমান মানসিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে না (ডাক্তারি ভাষায় Insight is absent)।

নিউরোটিক ও সাইকোটিক দু-ধরনের বিভাগেই অনেক রকম মানসিক রোগ দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য সন্দেহবাতিক অসুখটা কিন্তু 'সাইকোটিক ডিসঅর্ডার' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। যদিও বর্তমানে মানসিক অসুখগুলোকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে দলভুক্ত করা হয়েছে, তবু যাতে সাধারণের বোধগম্য হয় সেই কারণেই এই বিশেষ দু-টি প্রধান বিভাজনের উল্লেখ করা হল।

> সন্দেহ বা Delusion হল মাথায় গেঁথে যাওয়া এমন এক বিশ্বাস যার হাজার অযৌক্তিকতা বা প্রমাণের অভাব থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি তাতে অটল থাকেন।

সন্দেহবাতিক রোগটি কী?

'সন্দেহবাতিক রোগ' (Delusional Disorder) এই নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এই রোগের প্রধান উপসর্গ 'সন্দেহ' যাকে মনোবিদ্যার পরিভাষায় বলা হয় ডেলুউশন (Delusion)। আসুন দেখা যাক এই ডেলুউশন কী?

Delusion is a false, firm belief with which the person is preoccupied and to which the person firmly holds despite the logical absurdity of the beliefs and a lack of supporting evidence অর্থাৎ সন্দেহ বা Delusion হল মাথায় গেঁথে যাওয়া এমন এক বিশ্বাস যার হাজার অযৌক্তিকতা বা প্রমাণের অভাব থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি তাতে অটল থাকেন। অসংলগ্ন (bizarre) বা সংলগ্ন (non-bizarre) এক বা একাধিক এমন সন্দেহজনক বিশ্বাস এক মাস বা তার বেশি সময় দেখা দিলে সন্দেহবাতিক রোগ হয়েছে বলে ধরা হয়।

সংলগ্ন সন্দেহ বা বিশ্বাস (Nonbizarre Delusion)

যেমন—'কেউ আমাকে ঠকাতে চায়', বা 'আমার বন্ধুটি সরকারের প্রতিনিধি' ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ কি না এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া নেহাতই অমূলক নয়। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও সেই বিশ্বাস বা সন্দেহে আটকে থাকা হয়।

অসংলগ্ন সন্দেহ বা বিশ্বাস (Bizarre Delusion)

যেমন—'কোনো এক অপরিচিত লোক আমার ভিতরের কোনো অঙ্গ কেটে নিয়েছে।' (কোনো দাগ বা কাটার চিহ্ন ছাড়াই)।

সন্দেহবাতিক রোগের সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এটা অন্যান্য সাইকোটিক অসুখগুলোর মতো নয়, কেননা এক্ষেত্রে শুরুর দিকে ব্যক্তির সামাজিক, প্রাত্যহিক বা অন্যান্য বুদ্ধিগত (intellectual activity) কাজকর্ম খুব বেশি প্রভাবিত হয় না। বাইরের আচরণ দেখে বা কথাবার্তা শুনে প্রথম দিকে বোঝার উপায় নেই যে সে কোনো মানসিক রোগে ভুগছে। তবে একমাত্র সন্দেহজনক কোনো বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই রোগ নির্ণয়ের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে ও দেখে নিতে হবে যে

অন্যান্য সাইকোটিক মানসিক রোগের ক্ষেত্রে যেসব অসংলগ্ন বিশ্বাস কাজ করে, তার থেকে সন্দেহবাতিক রোগ যে যে কারণে আলাদা, সেই উপসর্গগুলো বর্তমান আছে কিনা।

তবে চট করে দেখে নেওয়া যাক সন্দেহবাতিক রোগ নির্ণয়ের শর্ত কী কী

১। স্কিজোফ্রেনিয়া অসুখের উপসর্গ থাকবে না। স্কিজোফ্রেনিয়া অসুখে সন্দেহবাতিক চিন্তা থাকে, সঙ্গে আরও উপসর্গ থাকে।

২। ডেলুউশন থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য আচরণ অস্বাভাবিক বা অসংলগ্ন মনে হবে না।

৩। যদি মুড-সংক্রান্ত সমস্যা থাকে তা সন্দেহবাতিক চিন্তার তুলনায় অনেক কম স্থায়ী হবে।

৪। কোনো ওষুধ বা ড্রাগের কারণে উপসর্গ দেখা দেয়নি, এমন হবে না (যেমন মদের প্রভাবে সাময়িক অমূলক সন্দেহ)।

৫। সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা কমপক্ষে এক মাস দীর্ঘস্থায়ী হবে।

বিভিন্ন ধরনের সন্দেহবাতিক চিন্তা

১। **ইরোটোম্যানিক টাইপ** (Erotomanic Type)**:** এক্ষেত্রে মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে উচ্চ অবস্থানের (high status) কোনো মানুষ তার প্রতি প্রেমে আসক্ত হয়েছে।

২। **গ্র্যান্ডিওস্ টাইপ** (Grandiose Type)**:** এক্ষেত্রে ব্যক্তির মনে হয় তার বিশেষ ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি আছে বা অনেক বড়ো বড়ো মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা আছে। বা সে অসীম জ্ঞানের অধিকারী। মানে শ্রেষ্ঠত্বের একটা ধারণা মনে গেঁথে যায়।

৩। **জেলাসি টাইপ** (Jealousy Type)**:** এমন ক্ষেত্রে মনে ধারণা হয় যে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীটা বিশ্বাসঘাতকতা করছে ও অন্য আর একজনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। শেক্সপিয়রের লেখা ওথেলো নাটকের 'ওথেলো' চরিত্র অনুযায়ী একে 'ওথেলো'স ডিসঅর্ডারও বলা হয়—

৪। **পারসিকিউটারি টাইপ** (Persecutory Type)**:** সব সময়ে মনে হয় তার ক্ষতি করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৫। **সোমাটিক টাইপ** (Somatic Type)**:** এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিটির মনে ধারণা হয় তার কোনো শারীরিক খুঁত আছে বা কোনো অসুখ আছে।

৬। **মিক্সড্ টাইপ** (Mixed Type)**:** মিশ্রিত অনেক রকম ধারণা গড়ে ওঠে ও কোনো একটা বিশেষ গুরুত্ব পায় না।

৭। **আনস্পেসিফায়েড টাইপ** (Unspecified Type)**:** অনেক সময় উপরিউক্ত ধারণার বাইরে কিছু ধারণা কাজ করতে পারে। তাকে unspecified type বলা হয়।

কয়েকটা ধারণা যা সচরাচর দেখা যায়:

১। ভগবানের সঙ্গে সরাসরি যোগ আছে। (Grandiose)

২। শরীরের মধ্যে দুর্গন্ধ ছাড়ছে বা চামড়ার নীচে পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। (Somatic type)

৩। আমার ক্ষতি করবে বলে স্পাই লাগানো হয়েছে আমার খাবারে বিষ দেওয়া হচ্ছে। (Persecution type)

সন্দেহবাতিক রোগের চিকিৎসা

১। **সাইকোথেরাপি:** সন্দেহবাতিক রোগের অন্যতম একটা চিকিৎসা পদ্ধতি হল সাইকোথেরাপি। এই ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল রোগীর সঙ্গে থেরাপিস্টের সম্পর্ক। শর্তহীন সম্পর্কের সঙ্গে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি রোগীর মনে হয় যে থেরাপিস্ট তাকে অস্বাভাবিক (abnormal) মনে করছেন তা হলে সে তৎক্ষণাৎ সাইকোথেরাপি করাতে অস্বীকার করতে পারে। সে জন্য থেরাপিস্টকে নজর রাখতে হবে যাতে তার ধারণা বা বিশ্বাসকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ না জানানো হয়। তার বদলে রোগীর জীবনের বাস্তবসম্মত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

কয়েকটি সেশন্ পরে কার্যকরী ও সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরই রোগীর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন পড়াশোনা বা চাকরিবাকরি) তার সুস্থসবল আচরণগুলিকে প্রোৎসাহিত (reinforce) করতে হবে। এর ফলে রোগীর মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় বাড়বে। যখন রোগী সামাজিক বা কর্মজীবনে নিরাপত্তাবোধের দ্বারা উজ্জীবিত হবে তখন ধীরে ধীরে তার বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে নিয়ে কাজ করতে হবে। সেগুলিকে ধীরে ধীরে যুক্তি দ্বারা বা চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে খণ্ডন করবার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে সন্দেহবাতিক রোগের ক্ষেত্রে সাইকোথেরাপি একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগোতে থাকে।

থেরাপিস্টকে হতে হবে সৎ ও সতর্ক। সে যেন রোগীর ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করবার আগে থেরাপির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাকে ভালোভাবে অবহিত করে। সূক্ষ্ম অর্থযুক্ত কথাবার্তা ও কখনো কখনো রসিকতার অন্য ব্যাখ্যা করে ফেলাই এই ধরনের রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক, তাই সেগুলো খুব সযত্নে এড়িয়ে চলাই ভালো।

মেডিকেশন: অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist) ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র খেলে এ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

লেখক পরিচিতি: রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট) ও প্রাবন্ধিক, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

হিংস্রতা

হিংস্রতার উৎস সন্ধানে একটা মনোবৈজ্ঞানিক অন্বেষণে—**ডা. সুমিত দাশ**

সেই কোন সুদূর অতীতে আমাদের অর্থাৎ এই হোমো সেপিয়্যান্সদের পূর্বসূরীরা আফ্রিকার ইথিওপিয়া থেকে তার যাত্রা শুরু করে। তারপর সমস্ত আফ্রিকা পেরিয়ে, আরব, ইউরোপ, এশিয়ার অন্যান্য অংশ অতিক্রম করে রাশিয়া দিয়ে আলাস্কায় ঢুকে আমেরিকায় প্রবেশ করে। তারপর উত্তর, মধ্য আমেরিকা পেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে গিয়ে তার যাত্রা শেষ করে। আর বলাই বাহুল্য তার এই যাত্রাপথ শান্তিপূর্ণ ছিল না। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার জন্য পথে পথে তাকে অনেক জীবজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু সব থেকে নিষ্ঠাভরে সে যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে তার স্বগোত্রীয় অন্যান্য 'হোমো' অর্থাৎ বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল সমস্ত প্রজাতির মানুষকে হত্যা, সেইজন্য পৃথিবীতে এই প্রজাতি হচ্ছে একদম একা। তার স্বগোত্রীয় আর কেউ জীবিত নেই। অর্থাৎ হিংস্রতার সূত্রপাত সেই সুদূর অতীত থেকে। তা হলে এ থেকে কি মুক্তি নেই? হিংস্রতা কি অবশ্যম্ভাবী? কিন্তু প্রশ্ন একই গ্রহে কী করে তবে চেঙ্গিস খাঁ-হিটলার জন্মায় আবার বুদ্ধদেব-চৈতন্যদেব জন্মায়? সুতরাং ডুব দেওয়া যাক মানবমনে। দেখা যাক কিছু উত্তর মেলে কি না।

প্রথমে দেখে নেওয়া যাক মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ কী করে হয়।

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ

জন্মানোর পর থেকে মানুষের ব্যক্তিত্ব কীভাবে বিকশিত হয় তার অনেকগুলো তত্ত্ব আছে। এ সম্পর্কে সবথেকে পুরোনো মডেল হচ্ছে ফ্রয়েডের সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল মডেল। আছে প্যাভলভের আর ওয়াটসনের বিহেভিহারিটিক মডেল এবং আছে হিউম্যানিস্টিক মডেল। প্রসঙ্গ অনুসারে এগুলো বলা হবে। বর্তমানে খুব বিস্তারিতভাবে এগুলি আলোচনার দরকার নেই। বরং পুরোনো এইসব মনঃসমীক্ষার মডেলের নির্যাস এবং আধুনিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মিলিয়ে যেভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পর্কে ধারণা করা হয়েছে সেগুলো আলোচনা করা হবে।

প্রথমেই বলতে হবে হেরিডিটি বা উত্তরাধিকারের কথা। এই গ্রহে ২০ লক্ষেরও বেশি প্রজাতির গাছপালা ও জীবজন্তু আছে। কিন্তু আমগাছ থেকে আমের চারা এবং ভেড়া ভেড়ার বাচ্চারই জন্ম দেয়। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গুণাবলি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় এটা পরিষ্কার। মানুষের ক্ষেত্রেও গায়ের পরবর্তী রং, চোখের তারার রং, উচ্চতা কেমন হবে এসব বৈশিষ্ট্য সে পিতা-মাতার থেকে পায়। কিন্তু এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটা বাচ্চা বাইরের উদ্দীপনায় কীভাবে সাড়া দেয় এবং প্রয়োজনমতো নিজেকে অভিযোজিত করে। দেখা গেছে খুব ছোটো থেকেই এ বিষয়ে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। একই শব্দে কোনো বাচ্চা ভয়ংকর চমকে ওঠে, কেউ আবার নির্বিকার থাকে। আর দেখা গেছে, এই পার্থক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারাজীবন বজায় থাকে। ধরা হয় মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে এতাবৎ জানা মহাবিশ্বের সব থেকে জটিল নির্মাণ। এই মস্তিষ্কই তাকে নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা, সেটা সঞ্চয় করে রাখা এবং ভবিষ্যতে সেই শিক্ষা কাজে লাগাতে শেখায়। তাই অন্য প্রজাতির মতো মনুষ্য প্রজাতিরও সামগ্রিক শিক্ষা, পদ্ধতিগতভাবে একই হলেও প্রত্যেকটা ব্যক্তির উত্তরাধিকারের সামান্য পার্থক্য আলাদা ব্যক্তিত্ব তৈরি করে।

দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে পরিবেশ—যেটা একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ প্রভাব ফেলে। কয়েক লক্ষ বছরের বিবর্তনের 'এন্ড প্রোডাক্ট' যেটা আমরা জিনের মাধ্যমে পাই, হচ্ছে বর্তমান মানুষ, একইভাবে কয়েক হাজার বছরের সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের 'এন্ড প্রোডাক্ট' হচ্ছে বর্তমান পরিবেশ। পরিবেশ বলতে একইসঙ্গে বোঝায় প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ গাছপালা, নদীনালা, জীবজন্তুকে এবং তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ। সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা একটা জনগোষ্ঠীর যেকোনো ব্যক্তি মানুষের জীবনের থেকে বৃহৎ প্রকল্প। যেটাকে তাদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা, বাচ্চা বড়ো করার ধারণা, ধর্মীয় বিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, অবসর সময় কাটানোর উপায় প্রভৃতি সম্পৃক্ত থাকে। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ একটা শিশুর বড়ো হতে এবং তার ব্যক্তিত্ব গড়তে প্রবল প্রভাব ফেলে। যে শিশু দেখে তার নিজস্ব গোষ্ঠীর মানুষজন অহিংসায় বিশ্বাসী সে সেভাবেই বড়ো হয়, আবার হিংসায় বিশ্বাসী গোষ্ঠীর শিশু বড়ো হয়ে হিংসায় বিশ্বাসী হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নিউ গিনির একই জাতির, একই ভৌগোলিক অঞ্চলে পাশাপাশি থাকা দু-টো গোষ্ঠীর কথা। অ্যারাপেশরা (Arapesh) শান্ত, দয়ালু এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আবার মুনডানগুমোররা (Mundungumor) রাগী, সন্দেহপ্রবণ এবং যুদ্ধবাজ হয়। এদের শিশুরা এভাবেই তৈরি হয়। আবার গোষ্ঠী সংস্কৃতির মধ্যে আছে ছোটো ছোটো দলের সংস্কৃতি, অনেকটা পাড়ার সংস্কৃতি বলা যায়। আর তারও মধ্যে আছে এক একটা পরিবারের সংস্কৃতি। তাই দু-টি মানুষ সম্পূর্ণ এক হয় না। জিন আমাদের শরীর ও মনের গঠন ঠিক করলেও চিন্তা, অনুভূতি এগুলি নির্ভর করে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ওপর। তৃতীয় বিষয়টা হচ্ছে ব্যক্তিসত্ত্বা বা self। এটি তৈরি হয় উপরি-উক্ত দু-টি বিষয় অর্থাৎ হেরিডিটি এবং পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়। এখন এই নিজস্বতা কীভাবে তৈরি হয় সেটা দেখা যাক। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চা ক্রমশ 'আমি' এবং 'অন্য'দের পার্থক্য করতে শেখে। এখন কোনো সমস্যা তার সামনে এলে তার আচরণ কেমন হবে সেটা নির্ভর করে তার নিজের সম্পর্কে অর্থাৎ 'আমি কী জানি', 'আমি কী চাই' এবং 'আমি কী করব' সেই ধারণার উপর। এখন এই 'আমি' ধারণাটা তৈরি হয় বাস্তবতা সম্পর্কে নিজের অনুমানের

উপর। এই অনুমানটার আবার তিনটি ভাগ আছে। সেগুলো এরকম—(১) বাস্তবতার অনুমান (reality assumption) অর্থাৎ সে নিজেকে এবং আশেপাশের দুনিয়াকে কী চোখে দেখছে। (২) সম্ভাবনার অনুমান (possibility assumption) অর্থাৎ নিজের এবং পারিপার্শ্বিককে কতটা পরিবর্তন করা যায় এবং কী সম্ভাবনা আছে উত্তরণের (৩) মূল্য অনুমান (value assumption) এটা বলতে বোঝায় কোনো জিনিস বা ঘটনার মূল্যায়ন করা। অর্থাৎ ঠিক-ভুল, উচিত-অনুচিত, বাঞ্ছনীয়-অবাঞ্ছনীয় সম্পর্কে মতামত তৈরি করা। এই প্রক্রিয়ায় 'আমিত্ব' একটা পটভূমি (ফ্রেম অফ রেফারেন্স) তৈরি করে। তার সামনে ঘটা যেকোনো ঘটনা সে এই ফ্রেম অফ রেফারেন্সের সাপেক্ষে বিচার করে। এটাই তাকে এক জীবনশৈলী শেখায় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়। আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী হলে সমাজের রীতিনীতি সে মেনে চলে—তখন সে সামাজিকভাবে সুস্থ। আর যদি তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভেঙে যায়, নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে, সে হয়ে যায় অসামাজিক। অর্থাৎ বলা যায় আমরা 'জিন' আর পরিবেশের যান্ত্রিক প্রভাবের পূর্ব নির্ধারিত ফল নই। এই 'আমি' বা 'ব্যক্তিসত্তা' মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্মাণে এক বিরাট ভূমিকা নেয়। তাই এখন সিদ্ধান্ত করা যায় গোষ্ঠীগতভাবে একই জিনের উত্তরাধিকার এবং একই সমাজ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল মানুষগুলোকে শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ অনেকটাই এক করে দেয় কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে প্রত্যেকটা মানুষ তার 'আমিত্ব' নিয়ে অসংখ্য সম্ভাবনা বা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। তাই এক অর্থে বলা যায় প্রত্যেকটা মানুষ কিছুটা প্রত্যেকটা মানুষের মতো, কিছুটা অন্য কয়েকজনের মতো এবং কিছুটা কারোর মতোই নয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই প্রেক্ষিতটা মাথায় রেখে আমরা এবার হিংস্রতার উৎস সন্ধান করি।

তাই এক অর্থে বলা যায় প্রত্যেকটা মানুষ কিছুটা প্রত্যেকটা মানুষের মতো, কিছুটা অন্য কয়েকজনের মতো এবং কিছুটা কারোর মতোই নয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই প্রেক্ষিতটা মাথায় রেখে আমরা এবার হিংস্রতার উৎস সন্ধান করি।

হিংস্রতার উৎস সন্ধান

মানসিক রোগের শ্রেণিবিভাগ করে যে সংস্থা সেই DSM (ডায়াগনসিস অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল ম্যানুয়াল) হিংস্রতাকে খুব সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করেছে। এখানে বলা হয়েছে অপরের প্রতি শারীরিক আঘাত করাকে হিংস্রতা বলে। কিন্তু মৌখিক হিংস্রতা অর্থাৎ ভয় দেখানো, চাকরির ক্ষেত্রে চাপে রাখা—এগুলোর গুরুত্বও অপরিসীম। এগুলোর কারণেও আক্রান্ত মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং এগুলোও মাথায় রাখা উচিত।

অনেক মানুষের চিন্তাতেই হিংস্রতার কথা আসে। কিন্তু যতক্ষণ না সেটা কাজে পরিণত হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কিছু কিছু মানসিক রোগে মানুষ হিংস্র আচরণ করতে পারে। যেমন মেন্টাল রিটার্ডেশান, অ্যাটেনশান ডেফিসিট অ্যান্ড হাইপার অ্যাকটিভ ডিসঅর্ডার, কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার স্কিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার ম্যানিয়া, ইন্টারমিটেন্ট এক্সপ্লোসিভ ডিসঅর্ডার, পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার ইত্যাদিতে।

দেখা গেছে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিংস্রতা দেখায় বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে, তবে কিশোররা অনেক ক্ষেত্রেই অপরিচিতের বিরুদ্ধে হিংস্রতা দেখায়। যারা খুন করে (অথবা ফাঁসি দেয়!) দেখা গেছে শতকরা ৫০ ভাগ মদ খেয়ে থাকে। এরকম কয়েকটা তথ্য মাথায় রেখে এবার আমরা হিংস্রতার কারণগুলি দেখি।

১। **মানসিক কারণ:** হিংস্রতার মানসিক কারণ খুঁজতে গেলে ফ্রয়েড সাহেব ও তার সাইকোঅ্যানালিসিস বা মনোসমীক্ষণকে স্মরণ না করে উপায় নেই। সিগমন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) যখন তাঁর তত্ত্ব নিয়ে আসেন তখন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সবেমাত্র শৈশব দশা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে আর মনোবিজ্ঞান তো হামাগুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু পেশায় নিউরোলজিস্ট ফ্রয়েড তার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এমন কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেন যেটা বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিতর্কিত; কিন্তু আজও তার চিন্তাভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফ্রয়েড ভেবেছিলেন মানুষের আচরণের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে ইদ (Id)। তিনি যৌনতা বা সেক্সকে এর মূল ভেবেছিলেন কিন্তু তাঁর কাছে এই যৌনতার ছিল আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপট অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনীশক্তি বুঝিয়েছিলেন। এই 'ইদ' কাজ করে তার ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ এখনি তার যা প্রয়োজন খাওয়া-দাওয়া, যৌনতা, আনন্দ ইত্যাদি যেকোনোভাবেই তাকে করতে হবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এরকম তো চলতে পারে না। তাই তিনি আর একটা পরিভাষা ইগো (Ego) ব্যবহার করলেন। ইগো ইচ্ছাপূরণ করে কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে, যাতে ব্যক্তি মানুষটি বেঁচেবর্তে থাকতে পারে। যেহেতু ইদ এবং ইগো সর্বদা দ্রুত চলনশীল এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে বিদ্যমান তাই তিনি তৃতীয় আর একটি সিস্টেম সুপার ইগোর (superego) প্রস্তাব দিলেন। এই সুপার ইগোকে বিবেক বলা যায় যে নৈতিক অনৈতিক, ঠিক-ভুল নির্দিষ্ট করে।

একটু আগে বলা জীবনী শক্তি বা Life instinct-কে ফ্রয়েড নামকরণ করলেন ইরোস (Eros)। এটাই নতুন জীবন সৃষ্টি ও জীবনের বিকাশে সাহায্য করে। তিনি ভাবতেন কোনো কারণে ইরোস বাধাপ্রাপ্ত হলে মানুষের মনে হিংস্রতা সৃষ্টি হয়। ফ্রয়েডের চিন্তাভাবনা ওলোটপালোট হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, মানুষের প্রতি মানুষের নৃশংসতা, হিংস্রতা ফ্রয়েডকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল। তিনি আর একটি তত্ত্ব খাড়া করলেন। তিনি বললেন মানুষের মধ্যে আর একটা শক্তি কাজ করে যেটাকে মৃত্যু প্রবৃত্তি বা Death Instinct বলে—যার নাম তিনি দিলেন থ্যানাটোস (Thanatos)। তিনি বললেন এই থ্যানাটোসের কাজ হচ্ছে নিজেকে ধ্বংস করা। কিন্তু কোনোভাবে সেই কাজে সে বাধাপ্রাপ্ত হলে যা এই শক্তি অপর্যাপ্ত হলে সে অপরকে ধ্বংস করে। যার প্রকাশ হয় হিংস্রতায়।

কনরাড লোরেন্জ আর একটি তত্ত্ব আনলেন। তিনি বললেন প্রবৃত্তিগতভাবে বিভিন্ন প্রাণী খাদ্য, বাসস্থান, যৌনতার জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। মানুষও আর একটা প্রাণী মাত্র তাই তার মধ্যেও এই যুদ্ধ প্রবণতা আছে। সেখান থেকেই আসে হিংস্রতা।

কিন্তু এই দু-টি তত্ত্বের বিরোধিতা পাওয়া যায় শেখা আচরণ বা Learned

Behavior তত্ত্বের মধ্যে। এর মূল খুঁজতে গেলে আমাদের পৌঁছোতে হবে আইভ্যান প্যাভলভের (১৮৪৯-১৯৩৬) সময়ে। তিনি কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখান যে, কোনো প্রাণী তার আচরণ শেখে পারিপার্শ্বিক থেকে। এখানে প্যাভলভের কাজ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে না। যেটা মনে রাখতে হবে অন্যান্য সামাজিক আচরণ শেখার মতো করে মানুষ হিংস্রতাও শিখতে পারে। অ্যালবার্ট বানদুরা মনে করেন প্রবৃত্তিগত কারণ বা কেবলমাত্র হতাশা কাটানোর জন্য মানুষ হিংস্র হয় না। প্রকৃতপক্ষে জন্ম থেকে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধাপে ধাপে মানুষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অপরকে দেখে অথবা কোনো ঘটনা দেখে হিংস্রতা শেখে। অর্থাৎ মানুষ তার পূর্ব অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের শিক্ষাদীক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণ থেকে হিংস্রতা শেখে। যেমন ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অসংখ্য মানুষকে হত্যাকারী সেনাবাহিনী মেডেল পায়। অথবা খেলার মাঠে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে জিতে খেলোয়াড়রা অর্থনৈতিক পুরস্কার পায়। অর্থাৎ হিংস্রতা মান্যতা পায়। এর প্রভাব পড়ে মানুষের মনে।

২। **সামাজিক কারণ:** জীবনটা খুব মসৃণ হত মানুষ যা চাইছে সেটা যদি সে অনায়াসে পেয়ে যেত। কিন্তু তা তো হয় না, চাওয়া-পাওয়ার ফারাকের জন্যে মানুষকে প্রতি মুহূর্তে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হচ্ছে। আর এই খাপ খাওয়ানোর চাপ থেকেই তৈরি হচ্ছে হতাশা। হতাশ মানুষ সবসময় হিংস্র আচরণ করে এরকম নয়। তারা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ভাগ্যকে মেনে নেন অথবা অবসাদে ভোগেন। হতাশা থেকে যে হিংস্রতা আসে দেখা গেছে তা দু-টি পরিস্থিতিতে হয়—প্রথমত হতাশা যদি তীব্র হয় মানুষ হিংস্র আচরণ করে। অর্থাৎ মৃদু ও মধ্যম হতাশায় মানুষ হিংস্র হয় না। দ্বিতীয়ত যদি হতাশাকে মান্যতা না দেওয়া হয়, অর্থাৎ ঘটনার প্রেক্ষিতে যদি ভাবা হয় এই হতাশা সঠিক নয় তবে হিংস্রতা বৃদ্ধি পায়।

এ ছাড়া আছে প্ররোচনা, দেখা যায় একটা উসকানিমূলক কথা একটা প্রক্রিয়া শুরু করে দেয় যাতে উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যেটা শেষ পর্যন্ত দু-টি ব্যক্তির বা দু-টি গোষ্ঠীর হিংস্র আচরণে পরিণত হয়।

এখন একটা বহুল আলোচিত বিষয় হচ্ছে মিডিয়া ভায়োলেন্স। অবশ্যই মিডিয়ার হিংস্র দৃশ্যায়ন মানবমনে, বিশেষ করে শিশুমনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। যেসব দেশে যেমন আমেরিকায় টিভি-র সামনে শিশুরা বেশি সময় দেয় তাই তাদের হিংস্রতাও বাড়ছে। আবার জাপান-সিঙ্গাপুরের মতো দৃঢ়বদ্ধ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই সমস্যা কম।

টেলিভিশন ভায়োলেন্স মানুষের মধ্যে বেশ কয়েক রকমভাবে হিংস্র মনোভাব জাগিয়ে তোলে। প্রথমত হিংস্র দৃশ্যায়ন মানুষের মধ্যে স্বল্পক্ষণের জন্য একটা হিংস্র মনোভাব জাগিয়ে তোলে যেটা তাকে তাৎক্ষণিক প্ররোচনায় পা দিতে উদ্দীপ্ত করে। দ্বিতীয়ত এই টেলিভিশন ভায়োলেন্স পৃথিবীকে একটা ভয়ংকর হিংসা-দীর্ণ জায়গা হিসাবে দেখায়। সুতরাং এখানে বাঁচতে গেলে হিংসার আশ্রয় নিতে হবে এটাই শেখায়। তৃতীয়ত দেখা গেছে টেলিভিশনে দেখানো হিংসার শতকরা ৪০ ভাগ নায়করা করে। অর্থাৎ হিংস্রতা এক ধরনের মান্যতা পায়।

কিন্তু হিংস্রতার ধারণা পেলেই লোকে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে না। চিন্তা করা আর প্রকৃত অর্থে একজন মানুষকে আঘাত করা বা হত্যা করা এক বিষয় নয়। মানসিকতাকে কার্যে পরিণত করা হয় কয়েক রকম ভাবে। প্রথমত দর্শক নতুন নতুন পদ্ধতিতে তার শিকারকে যন্ত্রণা দেওয়া বা হত্যার পদ্ধতি শেখে। দ্বিতীয়ত বারবার হিংস্র আচরণ দেখে তার মনের নিয়ন্ত্রণ এবং হিংস্রতার প্রতি সংস্কারজনিত বাধা কেটে যায়। হিংসার শিকার মানুষটার প্রতি তার আবেগ অনুভূতি কমে যায়। এক অর্থে অনুভূতিগুলি ভোঁতা হয়ে যায়। তাই প্রকৃত ঘটনার সময় তার আর হিংস্রতার আশ্রয় নিতে মানসিক বাধা থাকে না।

৩। **পরিবেশগত কারণ:** বিভিন্ন কারখানা থেকে নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস মানুষকে বিরক্ত করে তোলে যেটা অনেকক্ষেত্রেই তার আগ্রাসী মনোভাবের কারণ। বিভিন্ন গবেষণা দেখিয়েছে তীব্র শব্দদূষণ মানুষকে হিংস্র করে তোলে। বাড়িতে, কাজের জায়গায়, রাস্তাঘাটে প্রচণ্ড ভিড় মানুষের মনে চাপ বাড়ায়। এটা তার হিংস্র আচরণে প্ররোচনা দেয়। এ ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক কাজকর্মও আগ্রাসী করে। বর্তমান যুগে বেঁচে থাকাটাই একটা প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে তাই মানুষের আগ্রাসী মনোভাবও বেড়ে গেছে। যৌনতা সম্পর্কিত ছবি মানুষকে হিংস্র করে তোলে। আর আছে 'যন্ত্রণা' পাওয়া। দেখা গেছে যে মানুষ কখনো যন্ত্রণা পেয়েছে সে অপরকে যন্ত্রণা দেওয়ার মতো হিংস্র আচরণ করে। আর তখন তার আক্রমণের লক্ষ্য যে কেউ হতে পারে।

৪। **জৈবনিক কারণ:** কতগুলো হরমোনের প্রভাবে আগ্রাসন বাড়তে পারে। অ্যান্ড্রোজেন বৃদ্ধির সঙ্গে হিংস্রতার যোগাযোগ আছে। সাধারণত দেখা যায় অ্যাসিটাইল কোলিন, ডোপামিন এরা আগ্রাসন বাড়ায় অপরদিকে সেরটনিন, গামা অ্যামাইনো বিউটাইরিক অ্যাসিড (GABA) আগ্রাসন কমায়। এছাড়া শৈশবে অত্যাচারিত মানুষের কিছু স্নায়ুঘটিত পরিবর্তন আসে যেটা তাকে পরবর্তীকালে হিংস্র করে তোলে। খুব নিশ্চিত না হলেও কিছু কিছু সমীক্ষা নির্দেশ করে যে হেড ইনজুরি বা মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত মানুষেরা পরবর্তীকালে হিংস্র আচরণ করে। বিভিন্ন গবেষণা দেখিয়েছে জিন ও ক্রোমোজোমের জটিলতার প্রভাবে মানুষ হিংস্র আচরণ করে।

যার কথা না বললে হয় না

অন্তত দু-দশক আগে সুমন রাষ্ট্র নিয়ে একটা গান লিখেছিলেন। ঠিক মনে নেই, ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু কথা। "... রাষ্ট্র মানে জন্মেই নাগরিক করণিক ... রাষ্ট্র মানে মিলিটারি"। এরকম কিছু ছিল। এই সুমনই কিছুদিন আগে আর একটা গান লিখেছেন। "... বীর মরে বীরের মতো, বীর মরে একা, বন্ধুরা আবার হবে বিদ্রোহে দেখা। ... গান বাঁচে গানের মতো, গান বাঁচে একা, কমরেড আবার হবে, বিদ্রোহে দেখা।" প্রথম গানে সুমন তার মতো

করে রাষ্ট্রকে বর্ণনা করেছেন— যেটা হচ্ছে ক্ষমতার কেন্দ্র এবং সেই ক্ষমতাকে সে ব্যবহার করে। আর দ্বিতীয় গানটি—যেটা বিতর্কিত। নাম না করে তিনি ভুয়ো সংঘর্ষে নিহত কোনো এক বিদ্রোহীর কথা বলেছেন। দু-টো গান মিলিয়ে হয়তো বলতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের ক্ষমতার স্ট্রাকচার থাকলে বিদ্রোহও হবে। আর বিদ্রোহ দমনে রাষ্ট্র হিংস্রতা দেখাবেই।

এই স্টেট ভায়োলেন্স বিষয়টা খুব বিতর্কিত। কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। রাষ্ট্র যখন কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় লক্ষ্যে পৌঁছোতে তার নিজের নাগরিককে আক্রমণ করে তাকে স্টেট ভায়োলেন্স বলা যেতে পারে। এখানে তার হাতিয়ার হচ্ছে পুলিশ-মিলিটারি। অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় মদতে অন্য কোনো সংস্থাও এই আগ্রাসনে অংশগ্রহণ করে। আবার যখন এক রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রে কোনো সংস্থার মাধ্যমে ভায়োলেন্স চালায় তাকে বলা যায় স্টেট স্পনসর্ড ভায়োলেন্স। যাই হোক, মজাটা হচ্ছে কোনো রাষ্ট্র কখনো স্টেট ভায়োলেন্স স্বীকার করে না। তাদের কাছে এটা রাষ্ট্রের নাগরিকের নিরাপত্তার খাতিরে কিছু অপরাধ দমনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার বেশি কিছু নয়। যাই হোক এই রাষ্ট্রীয় বিষয়টা নিয়ে বেশি আলোচনা করার সাধ্য আমার নেই বা এই নিবন্ধ সেই জায়গাও নয়। এর জন্য অন্য গুণীজনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এখন দেখা যাক হিংস্রতার কোনো প্রতিকার আছে কি না।

মুক্তির উপায়

আগ্রাসন বা হিংস্রতা থেকে মুক্তির উপায় সহজ নয়। কতকগুলো প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেহেতু সমস্যাটা খুব পুরোনো, তাই কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়াই আগ্রাসীকে শাস্তি দানের ব্যবস্থাকে করে আসা হচ্ছে আবহমানকাল ধরে। খুব সামান্য শাস্তিও কিছু কিছু সময়ে লাভজনক হয়। কিন্তু সবসময় তা হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষটি এটাকে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসাবে দেখে, তাই পরবর্তীকালে সে আরও জোরালো প্রতি আক্রমণের চেষ্টা করে। ক্যাথারসিস বা আগ্রাসী শক্তির বহিঃনিষ্ক্রমণ অনেক ক্ষেত্রে কাজে দেয়। যেমন ছোটা, মুষ্টিযুদ্ধ করা ইত্যাদি। এতে করে তাদের হিংস্রতার শক্তি অন্য পথে চলে বলে ভাবা হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এতে আগ্রাসন বেড়েও যায়।

এখনও পর্যন্ত দেখা গেছে সোশ্যাল স্কিল ট্রেনিং সব থেকে কার্যকরী হয়। অর্থাৎ যারা হিংস্র আচরণ করে ধরা হয় তাদের সমাজে মেশার মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষা থাকে না। তাদেরকে এই সমাজ উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। মানুষকে প্রয়োজনে অনুরোধ করা, কোনো বিষয় সমাধানের জন্য পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে মত বিনিময় করা ইত্যাদি এই সোশ্যাল স্কিল ট্রেনিং-এর মধ্যে পড়ে। দেখা গেছে আগ্রাসী যুবক, পুলিস এ ধরনের গোষ্ঠীর হিংস্রতা কমাতে এই ট্রেনিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

যখন কোনো মানুষ অন্য কাউকে আঘাত করে সাধারণত আক্রান্ত মানুষটার কষ্ট বা যন্ত্রণাকে সে উপেক্ষা করে। কিন্তু পরবর্তীকালে আক্রমণকারীকে এ বিষয়ে সচেতন করলে, তার মধ্যে সহমর্মিতা ও অপরাধবোধ জাগাতে পারলে হিংস্র আচরণ কমানো যায়। হালকা হাসি-ঠাট্টার পরিবেশ আগ্রাসন কমাতে সাহায্য করে।

আর আছে ওষুধ, বিশেষ করে কম বয়সিদের লিথিয়াম নামে ওষুধ খুব কার্যকরী হয়। এছাড়া আরও কিছু মৃগীরোধী ওষুধ এবং উত্তেজনা কমানোর অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ কাজ করে। কিছু অবসাদরোধী ওষুধও ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে: দেখা গেল হিংস্রতা তৈরিতে মানুষের জিনের থেকেও বড়ো ভূমিকা নেয় তার পরিবেশ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। তাই এটা এমন একটা বিষয় যেখানে সমাধানের জন্য সমাজের সামগ্রিক সুস্থতার প্রয়োজন বিশাল। এর জন্য সমগ্র সমাজ ব্যবস্থারই বদলের প্রয়োজন। বেশিরভাগ মানুষের জন্য ভাববে এরকম ভালো সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যে লড়ছে অনেক রাজনৈতিক দল। পুরোনো নজির বলতে রাশিয়া, চীনসহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। কিন্তু তাদের পতন অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন। অর্থাৎ ভায়োলেন্স—কিন্তু ভায়োলেন্স দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পরে ভায়োলেন্সকে কি বর্জন করা যায়? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলিতেও তার রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যে সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়। তা হলে উপায় কী? অপরদিকে বর্তমানে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে যেকোনো মানব ও সামাজিক সূচকে—যেমন দুর্নীতি, অপরাধ প্রবণতা, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য রোধে, লিঙ্গ পার্থক্য রোধে ইত্যাদিতে সবসময় ভালো অবস্থানে থাকে। তাহলে শিক্ষা কি এসব দেশ থেকে নেওয়া যায়? প্রশ্নগুলি সহজ—আর উত্তর কিন্তু অজানা।

লেখক পরিচিতি: ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসার জন্য তৈরি একটা ক্লিনিকের সঙ্গে বহু বছর ধরে যুক্ত।

চেনা ওষুধ অজানা কথা

র‍্যানিটিডিন

ব্যথার ওষুধ খেতে হবে, সঙ্গে একটা র‍্যান্টাক খাওয়া চাই। বাইরে কোথাও খেয়ে বদহজম হয়েছে দোকান থেকে একটা হিস্ট্যাক কিনে খেয়ে নিলেন। র‍্যান্টাক আর হিস্ট্যাক হল র‍্যানিটিডিনের বহুল প্রচলিত দু-টো ব্র্যান্ড। যে গোষ্ঠীর ওষুধ এটা তাকে বলে এইচ$_২$ -ব্লকার (H_2-blocker)— হিস্টামিন$_২$ গ্রাহক প্রতিরোধক।

বছর ত্রিশেক আগে অ্যান্টাসিডই ছিল পেপটিক আলসারের, অম্বল-বুকজ্বালার চিকিৎসার প্রধান অবলম্বন। অ্যান্টাসিড পাকস্থলীর অ্যাসিডকে প্রশমিত করে। এইচ$_২$- ব্লকার পাকস্থলীতে অ্যাসিড ক্ষরণ কমিয়ে দেয়, ফলে আলসার সেরে উঠতে পারে। প্রথম যে এইচ$_২$- ব্লকার বাজারে আসে তার নাম সিমেটিডিন। সিমেটিডিন দিনে তিনবার খেতে হত, তা ছাড়া লিভারের কিছু উৎসেচকের ওপর এর প্রভাব থাকায় অনেক ওষুধের সঙ্গে সিমেটিডিন খাওয়া যেত না। কয়েক বছর পরে আসা র‍্যানিটিডিনে সেসব সমস্যা রইল না।

র‍্যানিটিডিন যে রূপে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তা হল ১৫০ মিলিগ্রামের বড়ি। তা ছাড়া পাওয়া যায় ৩০০ মিলিগ্রামের বড়ি। সিরাপ র‍্যানিটিডিনে ২ মিলিলিটারে থাকে ৫০ মিলিগ্রাম। ইঞ্জেকশনেও তাই—২ মিলিলিটারে ৫০ মিলিগ্রাম, খুব আস্তে শিরায় লাগাতে হয়।

আলসার সারাতে র‍্যানিটিডিন ১৫০ মিলিগ্রামের বড়ি দিনে দু-বার, দেড় মাস খেতে হয়। আলসার হওয়া ঠেকাতে ১৫০ মিলিগ্রামের বড়ি রাতে একটা করে খেয়ে যেতে হয়।

খাবারের সঙ্গে বা ঠিক পরে এ ওষুধ খাওয়া ভালো। রাতে খাওয়ার পর খেলে সব চেয়ে বেশি সময় পাকস্থলীর অ্যাসিড কম থাকে।

যদি ওষুধের কোনো ডোজ খেতে ভুলে যান, তা হলে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিন। যদি পরের ডোজের সময় প্রায় হয়ে গিয়েই থাকে তা হলে অবশ্য ভুলে যাওয়া মাত্রা খাবেন না।

বেশি মাত্রায় র‍্যানিটিডিন খেলে কিন্তু বিপদ হতে পারে। বিভ্রান্তি, প্রলাপ বিকার, কথা জড়িয়ে আসা, চামড়ায় লালভাব, ঘাম দেওয়া, ঝিমুনি, মাসংপেশিতে খিঁচ লাগা, মৃগীর মতো খিঁচুনি বা গভীর অচেতনতা হতে পারে। এমন কিছু হতে দেখলে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

ডাক্তারে পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করবেন না।

লিভার বা কিডনির সমস্যা থাকলে এ ওষুধ সাবধানে ব্যবহার করতে হয়।

গর্ভাবস্থায় এই ওষুধের নিরাপত্তা প্রমাণিত নয়, তাই ব্যবহার না করাই উচিত।

মায়ের বুকের দুধের সঙ্গে র‍্যানিটিডিন বাচ্চার শরীরে যায়, তাই বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন যে মায়েরা তাঁদের এ ওষুধ না খাওয়া উচিত। যদি খেতেই হয় তা হলে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখা উচিত।

শিশু ও নবজাতকদের ক্ষেত্রে র‍্যানিটিডিনের নিরাপত্তা প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের এ ওষুধ না দেওয়া ভালো।

৬০ বছরের ওপরে কাউকে র‍্যানিটিডিন দিলে খেয়াল রাখা দরকার স্নায়বিক উত্তেজনা বা confusion হচ্ছে কি না।

যেসব খাবারে প্রোটিন বেশি সেগুলোতে পাকস্থলীতে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিড ক্ষরণ হয়। তাই র‍্যানিটিডিন খাচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের এমন খাবার না খাওয়াই ভালো। কোনো খাবারে বা পানীয়ে পেটে অসুবিধা হলে সেগুলোকেও বর্জন করা উচিত।

র‍্যানিটিডিনে মাথা ঝিমঝিম করতে পারে, তাই ড্রাইভিং বা অন্য বিপজ্জনক পেশায় সাবধান থাকতে হয়।

মদ পাকস্থলীর অ্যাসিডিটি বাড়ায় আর কমায় র‍্যানিটিডিনের কার্যকারিতা। মদ বর্জন করুন। ধূমপান পুরোপুরি বন্ধ করতে পারলেই ভালো। না হলে অন্তত র‍্যানিটিডিনের শেষ মাত্রার পর আর ধূমপান করবেন না। ধূমপানও র‍্যানিটিডিনের কার্যকারিতা কমায়।

খুব কম ক্ষেত্রে কিছু মানুষের র‍্যানিটিডিন ব্যবহারে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়—চামড়ায় ফুসকুড়ি, মাথাব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, বমিভাব, কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটে ব্যথা, বিভ্রান্তি, গলাব্যথা ও জ্বর, অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ, হার্টের ছন্দে বিশৃঙ্খলা, অস্বাভাবিক দুর্বলতা বা ক্লান্তি, যৌনক্ষমতা-হানি, ইত্যাদি। এমন কিছু নজরে এলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। অ্যান্টাসিডের সঙ্গে র‍্যানিটিডিন ব্যবহার করলে র‍্যানিটিডিনের কার্যক্ষমতা কমে। যদি দুটো ওষুধ এক সঙ্গে ব্যবহার করতেই হয়, র‍্যানিটিডিন খাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে অ্যান্টাসিড খাওয়া উচিত হবে না।

যেসব ওষুধের এন্টেরিক কোট থাকে, তাদের সঙ্গে র‍্যানিটিডিন খেলে এন্টেরিক কোট দ্রুত গলে যায়।

ছত্রাকবিরোধী ওষুধ কিটোকোনাজোলের কাজ করার ক্ষমতা কমায় র‍্যানিটিডিন। কিটোকোনাজোল খাওয়ার অন্তত দু-ঘণ্টা পর র‍্যানিটিডিন খাওয়া উচিত। সাধারণত ৮ সপ্তাহের বেশি র‍্যানিটিডিন খাওয়ার দরকার পড়ে না, তবে প্রয়োজনে উপসর্গ দেখা দিলে আবার কোর্সটা করা যায়। লাগাতার এক বছরের বেশি র‍্যানিটিডিন না খাওয়া উচিত, কেননা নিরাপত্তা প্রমাণিত নয়।

সংকলন: A Lay Person's Guide to Medicines, LOCOST, Vadodara, 2006 থেকে।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (দ্বি-বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরোনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

সদ্যোজাত শিশুদের জন্ডিস

জন্মাতে-না-জন্মাতেই জন্ডিস! জন্ডিস বা ন্যাবা বা পাণ্ডুরোগকে এমনিতেই ভয় পাই আমরা, তার ওপর ওই কচি বাচ্চার এমন ভয়ানক রোগ কী নিদারুণ ক্ষতিই না করবে! ব্যাপারটা কিন্তু তত ভয়ের নয়, যদিও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সাবধান না হলে বিপদ আছে—লিখছেন **ডা. অলোক হালদার।**

সদ্যোজাত শিশুদের জন্ডিস (পাণ্ডুরোগ) সম্পর্কে মায়েদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। মায়েদের হাজার প্রশ্ন—বাচ্চার মস্তিষ্কের ক্ষতি হবে না তো? স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ হবে তো? বড়ো বয়সে এই জন্ডিস আবার দেখা যাবে না তো বা লিভারের ক্ষতি হবে না তো? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে সদ্যোজাতদের জন্ডিস সম্পর্কে কয়েকটি কথা জানা প্রয়োজন, বাকি দুশ্চিন্তা শিশু বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

শতকরা ৮০ ভাগ পরিণত (Mature) এবং বেশিরভাগ অপরিণত (Immature) সদ্যোজাত শিশুর জন্মের ২/৩ দিন থেকে ৭ দিনের মধ্যে জন্ডিস হয়। বিলিরুবিন (Bilirubin) নামক যে রঞ্জক (Pigment) রক্তে বাড়লে জন্ডিস হয়েছে বোঝা যায় তার মাত্রা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 2mg/dl-এর বেশি হলেই বোঝা যায় অথচ সদ্যোজাত শিশুদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৭ মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটার (7mg/dl)-এর বেশি না হলে বোঝা যায় না।

বিলিরুবিন কীভাবে তৈরি হয়?

মূলত লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন এবং অন্যান্য 'হিম'ধারক প্রোটিন ভেঙে বিলিরুবিন তৈরি হয়।

হিম - বিলিভারডিন - বিলিরুবিন।

১ গ্রাম হিমোগ্লোবিন ভেঙে ৩৪ গ্রাম বিলিরুবিন তৈরি হয়। এই বিলিরুবিন মূলত অযুক্ত (unconjugated বা indirect) বিলিরুবিন যা লিভারে গিয়ে UDPGT নামক উৎসেচকের দ্বারা যুক্ত (conjugated or direct) বিলিরুবিন হয় এবং পিত্তরসের সঙ্গে বেরিয়ে খাদ্যনালীতে গিয়ে স্টারকোবিলিন ও ইউরোবিলিন তৈরি হয়ে মলমূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

শিশুদের শারীরবৃত্তীয় (Physiological) বা স্বাভাবিক জন্ডিস কাকে বলে?

বেশি মাত্রায় স্বল্পায়ু লোহিত কণিকা ভেঙে হিমোগ্লোবিন তৈরি হওয়া এবং সদ্যোজাত শিশুর অপরিণত লিভার সেই পরিমাণ বিলিরুবিন যুক্ত (কনজুগেট) না করতে পারার কারণে সদ্যোজাতদের জন্মের ২/৩ দিন থেকে ৭ দিন বয়সে ১২ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার পর্যন্ত বিলিরুবিন রক্তে বাড়তে পারে। এই মাত্রা স্বাভাবিক এবং একেই physiological জন্ডিস বলে। এই শারীরবৃত্তীয় জন্ডিস একটু বেশি মাত্রায় হয়ে যেতে পারে যদি—

- সদ্যোজাত শিশুটা অপরিণত (premature) হয়।
- যমজ বাচ্চার একটিতে জন্মের সময় বেশি রক্ত সঞ্চালিত হয় (TWIN to TWIN transfusion)
- কেফাল হিমাটোমা বা আঘাতজনিত কারণে মস্তিষ্কের চামড়ার নীচে রক্ত জমাট থাকলে।
- অনেক সময় মায়ের দুধের জন্য - বিশেষ কারণে।

কখন জন্ডিসকে রোগজনিত/খারাপ (Pathological) বলব।

- জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি জন্ডিস দেখা যায়।
- বিলিরুবিনের পরিমাণ যদি ১৫ মিলিগ্রাম বা তার বেশি হয়।
- যদি জন্ডিস ২ সপ্তাহ বা তার বেশি সময় থেকে যায়।
- যদি যুক্ত (conjugated) বিলিরুবিন ২ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার বা মোট বিলিরুবিনের ১৫ শতাংশের বেশি হয়।
- এইসব ক্ষেত্রে অবশ্যই চটজলদি চিকিৎসা শুরু করা দরকার।

প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিসের কারণ কী কী?

এর হাজারো কারণের মধ্যে মূল কারণগুলো হল—

১। বাচ্চা এবং মায়ের রক্তের গ্রুপ আলাদা হওয়া (যেমন মা O গ্রুপ বাচ্চা A বা B অথবা মা Rh(-)ve বাচ্চা Rh(+)ve ইত্যাদি)

২। লোহিত রক্ত কণিকা সহজে ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা বিশিষ্ট কিছু রোগ। যেমন—
- Hereditary spherocytosis
- Sickle cell disease
- G6PD deficiency disease

৩। কিছু মেটাবলিক রোগ বা হরমোনঘটিত রোগ-
- গ্যালাকটোসেমিয়া
- মধুমেহ রোগ
- হাইপোথাইরয়ডিজম।

অস্বাভাবিক মাত্রায় জন্ডিস হলে কী হবে?

এক্ষেত্রে প্রথমে জানা প্রয়োজন যে অযুক্ত বিলিরুবিন (unconjugated bilirubin) রক্ত থেকে মস্তিষ্কে পর্দা (blood brain barrier) ভেদ করে মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারে কিন্তু যুক্ত বিলিরুবিন (conjugated) প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে মস্তিষ্কের পর্দা ভেদ করতে পারে না। অযুক্ত বিলিরুবিনের পরিমাণ রক্তে ২০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার-এর বেশি হলে মস্তিষ্কের পর্দা ভেদ করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে নার্ভতন্তু (neurons) ধ্বংস করে ফলে কারনিকটেরাস (kernicterus) বা Acute bilirubin encephalopathy নামক ভয়ংকর রোগটি হয়ে বাচ্চার খিঁচুনি, জ্বর, অসাড় হয়ে যাওয়া, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে শিশুটি বেঁচে গেলেও chronic bilirubin encepatopathy হয়ে পঙ্গুত্ব, অসাড়তা, স্থবিরতা, cerebral palsy ইত্যাদি অস্বাভাবিকতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

যুক্ত বিলিরুবিন (conjugated bilirubin) বাড়ার কারণ, পরীক্ষানিরীক্ষা এবং চিকিৎসার কথা পরে আলোচনা করব।

বেশিমাত্রায় অযুক্ত বিলিরুবিন দিয়ে জন্ডিস হলে কী কী পরীক্ষা সাধারণত করা হয়?

বাচ্চা এবং মাকে পরীক্ষার পর প্রয়োজন অনুসারে যেসব ল্যাবরেটরি টেস্ট করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। বিলিরুবিনের পরিমাণ - যুক্ত / অযুক্ত
২। বাচ্চা / মায়ের রক্তের গ্রুপ
৩। রক্তের হিমোগ্লোবিন এবং রক্তকণিকার পরীক্ষা (CBC)
৪। থাইরয়েড হরমোন পরীক্ষা
৫। G-6PD নামক রক্তের অনুঘটকের পরীক্ষা।
৬। গর্ভাবস্থায় শিশুর কিছু বিশেষ সংক্রমণের (TORCH) পরীক্ষা
৭। লিভার ফাংশন পরীক্ষা
৮। কিছু মেটাবলিক (জন্মগত) রোগের পরীক্ষা

চিকিৎসা কী ?

চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হল অযুক্ত বিলিরুবিনের মাত্রা জলদি বেড়ে গিয়ে মস্তিষ্কের যাতে ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য তাকে কমিয়ে রাখা। এই কমিয়ে রাখার প্রধান উপায় হল ফোটোথেরাপি (phototherapy)।

ফোটোথেরাপি কী? কীভাবে কাজ করে? কোন শিশুকে দেওয়া হয়?

বিশেষ ধরনের নীল আলোর (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 425-475 nm) ব্যবহার করা হয়। 40cm দূর থেকে শিশুর খোলা শরীরে (শুধু চোখ এবং অণ্ডকোষ ঢেকে) দেওয়া হয়। প্রয়োজন অনুসারে ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টা বা তার বেশি আলো দেওয়া হয়। এই নীল আলো অযুক্ত বিলিরুবিনের প্রাকৃতিক আইসোমার (isomer)-কে অন্যরকম অক্ষতিকর আইসোমার (non toxic polar isomer)-এ রূপান্তরিত করে। এই আইসোমার লিভারে যুক্ত (conjugated) না হয়েও পিত্তরসের মাধ্যমে মলমূত্রের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। ফলে মস্তিষ্কের পক্ষে ক্ষতিকারক অযুক্ত বিলিরুবিনের মাত্রা রক্তে কমে যায়।

কোনো শিশুকে ক-দিন বয়সে কত ওজন হলে এবং বিলিরুবিনের মাত্রা কত হলে ফোটোথেরাপি দেওয়া হবে তার জন্য সাধারণভাবে একটা সারণি (Table) ব্যবহার করা হয়। যদিও শিশুর শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে বা অন্য রোগ থাকলে এই সারণির নিয়মও পরিবর্তন করা যায়।

ফোটোথেরাপি সারণি

জন্মের সময়কার ওজন gms	শিশুর বয়স (দিন)							
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	<100gms	3	3	3	5	5	7	7
	100-1249	5	5	5	7	8	10	12
	1250-1499	8	8	8	10	12	12	12
	1500-1749	10	10	10	12	12	13	13
	1750-1999	10	10	12	13	13	13	13
	2000-2499	10	12	12	15	15	15	15
	>2500	10	12	13	15	17	17	17

যদি ফোটোথেরাপির মাধ্যমে বিলিরুবিনের মাত্রা যথেষ্ট কমানো না যায় বা খুব তাড়াতাড়ি সযুক্ত বিলিরুবিন রক্তে বাড়ার ফলে তার মাত্রা মস্তিষ্কে পৌঁছানোর কাছাকাছি চলে যায় তবে শিশুর শরীরে নিজস্ব রক্ত বের করে দিয়ে অন্য রক্ত ঢোকানোর (exchange transfusion) প্রয়োজন হয়।

Exchange transfusion কী?

রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা অন্তত ৫০ ভাগ কমানোর জন্য শিশুর দেহের মোট রক্তের দ্বিগুণ পরিমাণ দাতার (donar) রক্ত দিয়ে রক্ত পরিবর্তন (Exchange) করা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে।

রক্তের বিলিরুবিনের মাত্রা কমানো ছাড়াও এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোহিত রক্তকণিকা (RBC), যেমন—Antibody Coated RBC, আধভাঙা RBC-গুলো দাতার RBC দিয়ে পরিবর্তিত হয়।

অনেক সময় শিশুটির রক্তাল্পতা (anaemia) বা রক্তাধিক্য (polycythemia) থাকলে তাও শুধরে যায়।

কী গ্রুপের রক্ত দিয়ে রক্ত অদল-বদল (exchange) হয়?

সাধারণত সদস্য সংগৃহীত (fresh) রক্ত (সাত দিনের মধ্যে সংগৃহীত রক্ত) whole blood, ব্যবহার করা হয়।

Rh গ্রুপের মিল (মা-শিশুর) না থাকার ক্ষেত্রে O (-)ve রক্ত এবং ABO গ্রুপের মিল না হওয়ার ক্ষেত্রে - O গ্রুপ দাতার RBC এবং AB গ্রুপ দাতা প্লাজমা দিয়ে তৈরি (Reconstituted blood) ব্যবহার করা হয়। প্রতিক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুর রক্তের সঙ্গে প্রদেয় রক্ত মিলিয়ে দেখা (cross match) হয়।

Exchange transfusion পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, এতে বেশ কিছু ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে। যেমন—

- রক্তে ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সুগার কমে যাওয়া
- রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা বেড়ে যাওয়া
- সংক্রমণের এবং রক্তক্ষরণের ঝুঁকি।

এবার আসি ডাইরেক্ট বা কনজুগেটেড (conjugated) বিলিরুবিনের মাত্রাধিক্যের কথায়।

যদি রক্তে যুক্ত বিলিরুবিন (conjugated)-এর মাত্রা 2mg/dl -এর বেশি বা Total bilirubin-এর 15% বা তার বেশি হয় তবে তাকে cholestasisবা পিত্তরস জমে যাওয়া বলে।

কেন হয়?

- কিছু জন্মগত সংগ্রমণ (যেমন Hepatitis B, C, Rubela, CMV, Herpes ইত্যাদি)
- কিছু জন্মগত মেটাবলিক রোগ যেমন: $\alpha_1$antitrypsis ঘাটতি, Rotor, Dubin-Johnson ইত্যাদি।
- পিত্তরস পরিবহণে বাধার কারণে (লিভারের ভিতরে অথবা বাইরে পিত্তনালী তৈরি না হওয়া অথবা বন্ধ থাকার কারণে)
- অসুস্থ শিশুকে দীর্ঘদিন স্যালাইনের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ (TPN) করার জন্য।

কী কী পরীক্ষা করা হয়—

এই সব পরীক্ষা সাধারণ পাঠকের কাছে একটু জটিল লাগবে। সুতরাং পরীক্ষাগুলোর নামটুকুই উল্লেখ করলাম, বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না।

- LFT, PT.
- TORCH screening
- α_1 antitrypsin assay
- Urine for reducing substances
- USG abdomen - কোলেডকাল (choledochal cyst) সিস্ট অথবা টিউমার খোঁজার জন্য
- লিভার স্ক্যান - 99mTc (HIDA, PIPIDA Scan)
- লিভার বায়োপসি।

চিকিৎসা কী?

মেডিক্যাল চিকিৎসা কারণ অনুসারে করা হয়।

Medium chain triglyceride জাতীয় ফ্যাট যা পিত্তরস ছাড়াই হজম হয়, ভিটামিন A,D,E,K খাদ্য যোগ করা হয়। Phenobarbitone, Cholestryamine জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

শল্য চিকিৎসা

আলট্রাসোনোগ্রাফি করে বা লিভার স্ক্যান করে যদি দেখা যায় লিভারের বাইরে পিত্তনালীতে (Extra hepatic bile duct) জন্মগত ত্রুটি আছে তবেই একমাত্র শল্য চিকিৎসার দ্বারা শিশুকে রোগমুক্ত করা যায়। এই অপারেশন অবশ্যই শিশুর জন্মের ২ মাসের মধ্যে করতে হয়, দেরি হলে আর করা যায় না। Hepatoporto enterostomy নামক অপারেশন করা হয় এবং শিশু দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

পরিশেষে বলি, এই বিষয়টা কিছুটা জটিল। যেটুকু আলোচনা করা গেল তার বাইরে বহু কারণ থাকে এবং অন্যান্য পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

তাই সদ্যোজাত শিশুদের জন্ডিস হলে ঠাকুমা দিদিমারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে 'এরকম জন্ডিস বাচ্চাদের হয়, নিজে থেকেই কমে যাবে' বলে ভেবে থাকেন তা সবসময় ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে তা বিপদের এমনকী শিশু মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। আবার, সবসময় খুব ভয় পাওয়ারও কারণ নেই, কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জন্ডিস খুবই মামুলি ব্যাপার। কোনটা মামুলি আর কোনটা বিপজ্জনক, সেটা বোঝা সব থেকে জরুরি।

লেখক পরিচিতি: ডা. অলোক হালদার, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক

সবার জন্য স্বাস্থ্য অর্থাৎ সরকার সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেবে—এমন এক ব্যবস্থা করতে গেলে আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করা চাই—ম্যাঙ্গালোরে সদ্য অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা কনফারেন্সে বলেছেন—**ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**

১৯৭৭-এ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আলমা আটায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে এক কনফারেন্সে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা '২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। আলমা আটার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ভারত। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের পর ১৫ বছর কেটে গেছে, তবু আমাদের দেশে এই লক্ষ্য অধরা।

আমরা যদি নিচের মানচিত্রের দিকে তাকাই তা হলে দেখব পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়ে গেছে।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগে ২০১০-এ ভারতের যোজনা কমিশন সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে এক উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল (High Level Expert Group on Universal Health Coverage) নিয়োগ করে। পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রধান ডা. শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বাধীন এই বিশেষজ্ঞ দল ২০১১-এ স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে তাঁদের সুপারিশ পেশ করেন।

উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞ দল যেসব বিষয় বিবেচনায় আনেন, সেগুলো এরকম—

১। মানব সম্পদের প্রয়োজন
২। চিকিৎসা পরিষেবা নাগালে আনা
৩। ব্যবস্থাপনায় সংস্কার
৪। জনসমুদায়ের অংশগ্রহণ
৫। ওষুধপত্র নাগালে আনা
৬। স্বাস্থ্য-পরিষেবায় অর্থের জোগান
৭। সামাজিক যে বিষয়গুলো স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

এই উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ অর্থাৎ সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেন এভাবে—আয়ের স্তর, সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ, জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে দেশের যেকোনো অংশে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের জন্য যথাযথ খরচের, দায়বদ্ধ ও

সঠিক, নিশ্চিত গুণমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা (উন্নয়নমূলক, প্রতিরোধমূলক, নিরাময়মূলক ও পুনর্বাসনমূলক) সমান লভ্যতা নিশ্চিত করা, ব্যক্তিদের ও জনসমুদায়গুলোকে স্বাস্থ্যের বৃহত্তর নির্ণয়কগুলোকে নির্ধারণ করে এমন জনস্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া,—সরকার এসব স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরিষেবার ব্যবস্থা করবেন এবং নিশ্চিত করবেন, যদিও সরকারই একমাত্র পরিষেবা প্রদানকারী হবেন—এমনটা নয়।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার যে নির্দেশক নীতিগুলো উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল স্থির করেন, সেগুলো এরকম—

- পরিষেবা সবার জন্য,
- পরিষেবা সবার জন্য সমান,
- কাউকে বাদ দেওয়া হবে না আর কারোর প্রতি বৈষম্য করা হবে না,
- পরিষেবা হবে যুক্তিসঙ্গত ও ভালো গুণমানের,
- আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে,
- রোগীর অধিকারগুলোকে সুরক্ষা দেওয়া হবে,
- সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা মজবুত করা হবে,
- পরিষেবায় দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা থাকবে,
- নীতি-নির্ধারণ ও পরিচালনায় জনসমুদায়ের যোগদান থাকবে।

তাঁরা সরকারি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলেন কেন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কার জরুরি—

- হাসপাতালে ভর্তি হন যাঁরা তাদের ৪০%-এরও বেশি ক্ষেত্রে চিকিৎসা করাতে ধার করতে হয়। গ্রামীণ এলাকায় ১৮% ও শহুরে এলাকায় ১০% রোগী কোনো চিকিৎসা পায় না।
- গ্রামীণ এলাকার ১২% ও শহরের ১% বাসিন্দা চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছোতেই পারেন না।
- ২৮% গ্রামবাসী ও ২০% শহরবাসীর চিকিৎসা করানোর পয়সাই নেই।
- যাঁদের ধার নিতে হয় বা সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়।
- হাসপাতালে ভর্তি মানুষদের ৩৫%-এরও বেশি হাসপাতালের খরচের ভারে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যান।
- জনসংখ্যার ২.২%-এর বেশি হাসপাতালের খরচের ভারে গরিব হয়ে যান।
- নাগরিকদের অধিকাংশ যারা স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে পারেন না তারা কম আয়ের মানুষ।

গ্রাম-শহরের বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা দেখান—

৮০% ডাক্তার, ৭৫% ডিসপেন্সারি, ৬০% হাসপাতাল আছে শহরে। পাশকরা ডাক্তারের ঘনত্ব যেখানে শহরে ১০,০০০ মানুষ-পিছু ১১.৩ জন, সেখানে গ্রামে ১০,০০০ জনে ১.৯।

বিশেষজ্ঞ-দল সমস্ত নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার প্যাকেজের কথা বলেন, যাতে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর চিকিৎসা-পরিষেবা থাকবে, সরকার যার খরচ জোগাবে। তাঁরা বলেন—এক বিশেষজ্ঞ-দল মাঝে মাঝে প্যাকেজের উপাদানগুলো ঠিক করবেন, রাজ্যভেদে প্যাকেজের উপাদানে পার্থক্য থাকতে পারে।

চিকিৎসার খরচ ও আর্থিক সুরক্ষা বিষয়ে দলের বক্তব্য ছিল—

- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো মিলে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বর্তমানের জিডিপি-র ১.৪% থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে অন্তত ২.৫% এবং ২০২২-এর মধ্যে অন্তত ৩% করা উচিত।
- ওষুধ কেনায় সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- চিকিৎসা পরিষেবার অর্থের মূল উৎস হবে সাধারণ কর, সঙ্গে যাঁরা মাইনে পান বা আয়কর দেন তাঁদের মাইনে বা করযোগ্য আয়ের অনুপাত হিসাবে অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক অর্থ প্রদান।

স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য মানব সম্পদ সম্পর্কে উচ্চস্তরীয় দলের সুপারিশ—

- পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী নিশ্চিত করা হোক, গুরুত্ব পাক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা।
- গ্রামীণ ও আদিবাসী এলাকায় ASHA-র সংখ্যা দ্বিগুণ করা হোক, জনসংখ্যার ১০০০ পিছু ১ থেকে বাড়িয়ে ১০০০ পিছু ২।
- মাঝারি স্তরের স্বাস্থ্যকর্মী চালু করা হোক—গ্রামীণ উপকেন্দ্রগুলোতে ব্যাচেলর অফ রুরাল হেলথ কেয়ার (BRHC) প্র্যাকটিশনার ও শহরের উপকেন্দ্রগুলোতে নার্স প্র্যাকটিশনার।

আমরা যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা দেখি তা হলে দেখব প্রতি ১০,০০০ মানুষ পিছু ২৫ জন চিকিৎসাকর্মীর সুপারিশ করা হয়েছে—অর্থাৎ ডাক্তার, নার্স, দাই, ইত্যাদি, কতজন কী তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। আমাদের দেশে এই সংখ্যা ১০,০০০ জনে ১৯ জন (প্রশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণহীন মিলিয়ে)। পাশকরা ডাক্তারের সংখ্যা যদি দেখি তা হয়—১০,০০০ জনে ৬ জন। গ্রামে যেখানে ১০০০০ জনে পাশকরা ডাক্তারের সংখ্যা ৩.৯ জন, সেখানে শহরাঞ্চলে ১৩.৩ জন অর্থাৎ প্রায় চারগুণ বেশি। দেশের প্রায় ৫ লক্ষ মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটের তিন-চতুর্থাংশ শহর বা শহরের আশেপাশে কাজ করেন, যেখানে দেশের এক-তৃতীয়াংশেরও কম মানুষের বাস। আর গ্রামীণ জনতার সামান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাটুকুও নেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে এক সার্ভেতে দেখা যায়—মাত্র ৬% রোগীর চিকিৎসা করেন এমবিবিএস ডাক্তার, ২৮%-এর AYUSH ডাক্তার আর ৬৬%-এর চিকিৎসা হয় প্রশিক্ষণহীন গ্রামীণ চিকিৎসকদের হাতে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়—সেখানকার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ, সরকারি ডাক্তারের সংখ্যা ১০ জনেরও কম, অথচ গ্রামীণ ডাক্তার প্রায় ৪০০ জন। একজন অসুস্থ শিশুকে সরকারি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয় অধিকাংশ সময় নদীপথে, সময় লাগে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা। ফলে ৮৫% অসুস্থ শিশুকেই চিকিৎসা পেতে হয় গ্রামীণ ডাক্তারের কাছে।

২০০৯-এ পশ্চিমবঙ্গের তিনটে জেলায় সার্ভে করে দেখা যায় ৫৪% গ্রামীণ মানুষ গ্রামীণ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসিত হন। খুব সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেজ (NICED)-এর এক সমীক্ষক-দল দেখেন মালদা জেলার গ্রামবাসীদের অর্ধেকেরও বেশি সাধারণ রোগের জন্য গ্রামীণ ডাক্তারদেরই সাহায্য নেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিসংখ্যানটা মোটামুটি এরকম—পাশকরা ডাক্তার আছেন প্রায় ৪৩ হাজার। সবার কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাশকরা ডাক্তারের মাধ্যমে পৌঁছোতে হলে দরকার আরও ৬৫ হাজার ডাক্তার, বর্তমান হারে

ডাক্তার তৈরি হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ২০৫৫ সাল অবধি।

আর সমস্ত স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য পাশকরা ডাক্তার কিন্তু জরুরিও নয়। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM)-এর টাস্ক ফোর্স ২০০৭-এর রিপোর্টে বলে—মারক রোগগুলোকে প্রতিহত করার জন্য উঁচু মানের ডাক্তারি দক্ষতা বা দামি রোগ-নির্ণয় প্রযুক্তির দরকার হয় না। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়েই এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায়। আসল সমস্যা হল মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা না-পৌঁছোনো।

এমবিবিএস-এর চেয়ে কম সময় যাঁরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তাঁদের ডাক্তারি দক্ষতা নিয়ে এক পর্যবেক্ষকের কথা বলি। পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার কৃষ্ণ ডি রাও এই সমীক্ষাটা করেন ছত্তিশগড়ের এক এলাকায়। ছত্তিশগড় ও আসাম হল দেশের দু-টো রাজ্য যেখানে কম সময়ের ডাক্তার তৈরির কোর্স চালু করা হয়। অবশ্য তাঁদের ডাক্তার বলা হয় না, ছত্তিশগড়ে বলা হয় রুরাল মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা আরএমএ। দেখা যায়—প্রাথমিক পরিষেবায় যে রোগ বা সমস্যাগুলো দেখা যায় সেগুলো সামলাতে এমবিবিএস ডাক্তার ও আরএমএ-রা সমান দক্ষ। কম দক্ষ AYUSH চিকিৎসকরা। প্যারামেডিক্যাল কর্মীরা সবচেয়ে কম দক্ষ।

বর্তমান সময় থেকে অনেক বছর পিছিয়ে যাই, নজর রাখি প্রতিবেশি দেশ চীনে। চীনে পাশ্চাত্য মেডিসিনের প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৮১ সালে। ১৯৪৯-এ শোষণমুক্তির আগে সে দেশে মেডিক্যাল কলেজ ছিল মাত্র একটা, ১৯১৬-এ স্থাপিত পিকিং ইউনিয়ন মেডিক্যাল কলেজ। সেই কলেজ থেকে ১৯২৪ থেকে ১৯৪২ অবধি পাশ করে বেরোনো মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, তাঁরাও মূলত বিদেশি শাসক-শোষকদের সেবায় লাগতেন। ১৯৪৯-এর পর কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের সরকার সমস্ত নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্ভব করেছিল, তা সম্ভব হয়েছিল আধুনিক ডাক্তারদের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণহীন গ্রামীণ চিকিৎসকদের যুক্ত করে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ চিকিৎসকদের যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত করার কাজ করে সোসাইটি ফর সোশ্যাল ফার্মাকোলজি রুরাল মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোশিয়েশনের সঙ্গে। কাজ করে বাঁকুড়ার আমাদের হাসপাতাল, বীরভূমে লিভার ফাউন্ডেশন।

প্রশিক্ষিত গ্রামীণ চিকিৎসকদের ওপর এক সমীক্ষা চালান ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা যায়—তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতির মানোন্নয়ন হয়েছে, ভুল ওষুধের ব্যবহার কমেছে, রোগীদের ক্ষতি কম হচ্ছে, রোগীরাও তাঁদের ওপর আস্থা স্থাপন করছেন।

জয়পুরের ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট রিসার্চের বরুণ কাঞ্জিলাল গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন বহুদিন। তাঁর সুপারিশ হল—সমস্ত গ্রামীণ ডাক্তারদের নথিভুক্ত করা হোক। তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক যাতে তাঁরা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারেন এবং নিজের সীমা কতটা তা বোঝেন। তাঁদের সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা হোক, যাতে তাঁরা সরকারি ডাক্তারদের নজরদারিতে কাজ করতে পারেন।

আমরাও মনে করি—গ্রামীণ চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যে দিয়েই চিকিৎসা কর্মীর অভাব পূরণ হতে পারে, কিছুটা বাস্তবায়িত হতে পারে সবার জন্য স্বাস্থ্যের স্বপ্ন।

লেখক পরিচিতি: ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, হাওড়ায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে তোলা এক ক্লিনিকে পূর্ণ সময়ের চিকিৎসক, ও *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র সম্পাদক।

সবার জন্য স্বাস্থ্যের দাবিতে সংগ্রামে সামিল হোন

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

বাবা কী?

সন্তানধারণের প্রবল আকুলতা। প্রিয় পুরুষের শুক্রাণু দান। সন্তানের জন্ম। কলকাতার প্রথম আইভিএফ একক মায়ের শারীরিক ও মানসিক টানা-পেড়েনের অভিজ্ঞতা লিখলেন—**ঈলীনা বণিক।**

রাত ভোর হয়ে এসেছে। আমার আড়াই বছরের মেয়ে অমরাবতীর এখন জ্বর হয়েছে। রাত তিনটেয় ঘুম ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বিছানা থেকে নেমে যায় সে। ঠান্ডা লাগলে মাঝরাতে যখন খুব জ্বর ওঠে, ওকে যখন কিছুতেই Crocin Syrup খাওয়াতে পারি না, ও খেতে চায় না, প্রবল প্রতিবাদে হাত-পা ছুঁড়ে সরিয়ে দেয়—তখন আমার নিজেকে পথের পাঁচালীর সর্বজয়ার মতো অসহায় মনে হয়। সর্বজয়া যখন একা ঘরে, ঝড়ের রাতে ভয়ে কাঁপে তেমনি যেন। এই রাতগুলো কী ভয়ংকর যে যায়----আমি বিবাহবিচ্ছিন্না / অবিবাহিতা, একক মা। না, আমার পাশে কোনো হরিহর নেই। তকাই-এর জ্বর হলে কখনো আমি একা ওকে ওষুধ খাওয়াতে পারি না, কখনো আমার মা, কখনো তকাই-এর পরিচারিকা আর আমি মিলে ওকে ওষুধ খাওয়াই।

চিত্র ১. ঈলীনা বণিক অঙ্কিত

আমার ছোট্ট মেয়ে অমরাবতী নাকি জিজ্ঞেস করেছে আমার মাকে—বাবা কী? কী বলব ওকে আমি? আমার মনে আসে বাবা= sperm donor = শুক্রাণুদাতা, যিনি প্রথম তাঁর শুক্রাণু দান করেন, যে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে জন্ম নেয় ভ্রূণ।

ওকে একটি সমবেত music zone-এর মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাই, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনি সমন্বয়ে অনেকগুলো পুরুষ ও নারীকণ্ঠ সেখানে গাইতে থাকে—

''শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আর্য্যা ধামানি দিব্যানী তস্থু
বেদাহ্ মিতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য-বর্ণং
তমসোঃ পরোস্থাৎ।"

আমার মনে বাজে সমস্বরে

''শোনো শোনো সুরলোকবাসী
অমৃতের যে আছো সন্তান,
জানিয়াছি সেই অবিনাশী
জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান
তপনবরণ তিনি, আঁধারের পারে যিনি
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়
নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপায়।"

এক অপূর্ব সংগীত আমার সত্তায় বাজে—

''নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্য রসভঙ্গিমা।"

আমার সন্তান অমরাবতী অমৃতস্য পুত্রী। অমৃতের সন্তান সে— 'একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।'

একটি কথা, আমার প্রথম যৌবনের গুপ্তপ্রেমের দ্বিধা থরথর চূড়ে—আমার প্রবল সন্তানবাসনা বলা হয়নি তখন প্রেমিককে। ভর করেছিল 'সাতটি সন্তানের জননী হতে পারতাম কি আমি? সাত কেন অনেক হাজার সন্তান আছে—আমার ছবি, আমার ভাস্কর্যে। আমি যখন ভাবি অমরাবতী (তকাই) অমৃতের সন্তান, আমার একটুও রাগ হয় না শুক্রাণুদাতা পিতার ওপর। সব কিছু তখন সুন্দর হয়ে যায়—

''অপূর্ব এক স্বপ্নসম
লাগতেছিলো চক্ষে মম—
কি বিচিত্র শোভা তোমার,
কি বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম
এ কোন মহারাজ।"

আমার সন্তানের পিতাকে একদিন হয়তো আমি এই চোখেই দেখেছিলাম আমার নিজস্ব abstraction দিয়ে। তকাই-এর donor father বা শুক্রাণুদাতা পিতার প্রতি আমার যেটুকু প্রেম, যেটুকু positive feeling, সুন্দর অনুভূতি তা সবই আজ স্মৃতি। যেটুকু আকর্ষণ—যা দিয়েছি, 'দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি. . .'। সবটাই আজ বড়ো গভীর কৃতজ্ঞতা—

''দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে
স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে—
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য করে।"

আমার এতটুকু দেবার ফল আমার পরমপ্রাপ্তি তকাই, অমরাবতী, আমার ভালোবাসার সন্তান, 'love child'। তকাইকে স্পর্শ করে আমি অনুভব

করি এইসব . . . আমি স্পর্শ করি, আমি অনুভব করি অমৃতের সন্তানকে। I adore the child of eternity within myself–within my body, within my mind. আমি যেন আদিম জননী, কোনো গুহামানবী, আমার মধ্যে 'ব্যক্ত' হয়েছে 'অসীমের চিরবিস্ময়'। অমৃতের সন্তান আমার স্তন্যপান করেছে কতদিন- রাত্রি। আমার মধ্যে অমৃতকে অনুভব করেছি আমি, অমৃত পান করেছি, স্তন্যদান করেছি দেবশিশুকে।

''অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হলো অবসান।'' গোটা IVF বা in vitro fertilization পদ্ধতিটাই একটা খেলা—অসীম মঙ্গলে তার সব মাধুরী মিলেছে এসে। আজ আর কোনো medical procedure-এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না, কোনো ছলনায় পুরুষকে আকর্ষণ করতে হবে না। আমার কন্যাসন্তান অমরাবতী (তকাই) এখন আড়াই বছরের। কিন্তু আমি তাকে তার পিতৃপরিচয় এখন দিতে পারব না—কোনোদিন কি পারব? পিতার প্রতি তার অশ্রদ্ধাও তৈরি হতে দিতে পারি না আমি। তাই বাবা যেন একটা বিশ্বব্যাপী concept, পিতা যেন এক অসীম বিমূর্ততা। আমার IVF যাত্রা এই so called পিতৃতন্ত্রের বিপরীতে, পিতৃতন্ত্রকে অস্বীকার করে এক বৃহত্তর মহাজাগতিক পিতার concept। তকাই-এর না হয়ে ওঠা অন্নপ্রাশনে, তারপর এক বছরের জন্মদিনে প্রথমে আরম্ভসংগীত হবার কথা ছিল—

''তুমি আমাদের পিতা তোমায় পিতা বলে যেন জানি
তোমায় নত হয়ে যেন মানি, তুমি কোরো না কোরো না রোষ
হে পিতা, হে দেব দূর করে দাও যত পাপ যত দোষ
তুমি কোরো না কোরো না রোষ।''

পিতার কাছে প্রথমে IVF-এর ধৃষ্টতার জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। পিতা যেন সেই ব্যক্তি যিনি সব সময় রোষ করেন, রাগ করেন, যাঁকে সব সময় মান্য করতে হয়। এবং আমার যাত্রা এই so called patriarchy-র বিরুদ্ধে। এক বৃহত্তর পিতৃত্বের concept নিয়ে এগোই আমি। আরও সম্প্রসারিত এক পরিবার-ব্যবস্থার ধারণা লালন করি এবং গড়ে তুলি। আমি বিবাহিত অবস্থায় আমার স্বামী ও তার বন্ধুদের সঙ্গে রেস্তোঁরায় তুমুল বিতর্ক করতাম—কেন একজন মেয়ে বিবাহিত স্বামীরই সন্তান গর্ভে ধারণ করতে বাধ্য? পছন্দসই অন্য কারও সন্তান নয় কেন?

আমার মধ্যে সন্তান-বাসনা ছিলই—শৈশব থেকে কৈশোর থেকে। হয়তো সব কন্যাসন্তানের মধ্যেই থাকে। সব মেয়েরা পুতুল খেলে, আমিও খেলতাম। সেই তো প্রথম মাতৃত্বের আরম্ভ। আমার ছোট্ট মেয়ে তকাই (অমরাবতী) পুতুল খেলে, সারাক্ষণ বলে আমার ছেয়ে (ছেলে)। ওর পুতুল ছেলের নাম 'হামুন', ওরই দেওয়া নাম। সব মেয়ের মধ্যেই বোধহয় মা আছে, আছে এক আদিম জননী—শৈশবে পুতুল খেলার অধিকার আছে সব মেয়ের, তখন মাতৃত্বের জন্য দরকার হয় না সমাজের দেওয়া license, বিবাহে স্বীকৃতি। প্রথমে মা হতে চেয়ে সফল না হবার কিছুদিন পরে যখন প্রথম গাইনোকোলজিস্টের কাছে গেলাম, ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—''আপনার তো বিয়ে হয়নি, তাহলে আপনি বাচ্চা চাইছেন যে!'' আমার বিয়ে হয়েছিল, মানে আমি বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু যখন ওই ডাক্তারের কাছে দ্বিতীয়বার গেছিলাম তখন আমি বিবাহবিচ্ছিন্না। যখন প্রথমবার ওই ডাক্তারের কাছে গেছিলাম তখন আমি সন্তানের জননী হতে চাইনি, অথচ সদ্যবিবাহিত ছিলাম। কিন্তু আমার চেতন এবং অবচেতন আমাকে বিবাহিত বরের সন্তানের জননী হতে সম্মতি দেয়নি, তাই আমি জন্মনিয়ন্ত্রণ চেয়েছিলাম। আমি ভ্রূণহত্যায় বিশ্বাসী অথবা সমর্থক নই, বরং জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী। বিবাহবিচ্ছিন্না হবার পর কত দিন ইচ্ছে হয়েছে সন্তানবাসনায় গিয়ে ওঁর পরামর্শ নিতে, হয়ে ওঠেনি অনেকদিন, অনেক সংকোচ এবং সংশয় বাধ সেধেছে।

কিন্তু বিবাহবিচ্ছিন্না হবার কিছু বছর পরে যখন আমার মধ্যে সন্তান-বাসনা প্রবল, তখন আমি সহজে সফল হইনি। তাই নারীচিকিৎসা-বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে পরামর্শ চাওয়া। চিকিৎসকের প্রশ্নের উত্তরে বলতে হল, আমি বিবাহবিচ্ছিন্না। তাই পুনর্বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত আমার সন্তান-ধারণের ইচ্ছা চিকিৎসকের মনে এবং বাক্যে, কৌতূহল জাগায়। তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেই ফেললেন—''আপনার তো বিয়ে হয়নি . . .!'' তারপর ঢোঁক গিলে মৃদু স্বরে বললেন—''ও single mother!'' আমি বড়ো বড়ো চোখে স্পষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কথা না বলে চিকিৎসকের চোখের দিকে পূর্ণ সৎসাহস নিয়ে। আমার দু-চোখে কী ছিল? প্রবল সন্তান-বাসনার আকুতি? ওই চিকিৎসক স্ত্রীচিকিৎসাবিশেষজ্ঞ হলেও প্রজনন প্রযুক্তি বা artificial reproduction technology (ART) নিয়ে কাজ বা গবেষণা করেন না। তাই তিনি নাম বলে দিলেন এই শহরের এক বিখ্যাত হাসপাতালের এক নামী তরুণ চিকিৎসকের। তাঁর কাছে যদিও আমার যাওয়া হয়নি।

আমি সর্বপ্রথম যে ART বিশেষজ্ঞের কাছে গেছিলাম তিনি কলকাতার প্রথম biological এবং legal single father শ্রী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তানের স্রষ্টা এবং সম্পূর্ণ IVF (in vitro fertilization) করে সন্তানটির জন্ম ঘটিয়েছিলেন। খবরের কাগজে এই সংবাদটি/article-টি দেখান আমার মা। আমি তৎক্ষণাৎ লেখিকার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই চিকিৎসকের নম্বর নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করি। এবং ওঁকে আমার সন্তান-বাসনার কথা জানাই। ওঁকে আমার marital status—বৈবাহিক অবস্থানও বলি। উনি আমাকে অচেনা পুরুষের শুক্রাণু দিতে চান। আমি অচেনা, অজানা উৎস থেকে শুক্রাণুগ্রহণে সম্মত হতে পারি না। কারণ, তখন আমার সঙ্গে এক মানসিক রোগবিশেষজ্ঞ, অতিসুশিক্ষিত, পরমবন্ধু শুক্রাণুদাতা (donor) ছিলেন।

আরও কিছু দিন চলে গেল। এ যেন
'মরি হায় চলে যায় . . . বসন্তের দিন চলে যায়'
'কোন রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে
. . .বারে বারে কান পেতে রই . . . ও আমার আপন হৃদয় গহন-দ্বারে বারে বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে—
বারে বারে।'

শান্তিনিকেতনে আমার দ্বিতীয় প্রেমিক এই গান গাইত বড়ো আকুল সুরে। এটা পরে আমার reality হয়ে উঠল। আমি ভাবলাম, অনেক রাত, অনেক না ঘুমোনো রাত, অনেক রৌদ্রতপ্ত দিন, 'মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি।' কিন্তু পাখি কেন মধ্য দিনে গান বন্ধ করবে? পাখি তো গান গাইবেই নতুন সূর্য ওঠা সকালে, প্রভাতেরও আগে morning prelude,

চিত্র ২. ঈলীনা বণিক অঙ্কিত

সূর্যাস্তের গোধূলিতে। আমার পরিপূর্ণ যৌবনে আমি মেনে নিতে পারিনি সব বাসনার অবসান। বরং পূর্ণতা চেয়েছি মাতৃত্বে এবং নিজের পূর্ণ আকর্ষণের শুক্রাণু গর্ভে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে মুক্তি চেয়েছি এই আকাশে . . .

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়,
দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে।'

বর্তমানে তৃণমূলের মন্ত্রী-বিধায়ক সেই চিকিৎসকের কাছে হল না এই অভিযানের আরম্ভ, আরও কিছুদিন গেল।

এরপর গেলাম কলকাতার সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ প্রবীণতম বৃদ্ধ চিকিৎসকের কাছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে test tube baby-র ইতিহাস, প্রথম test tube শিশুর জনক ডা. সুভাষ মুখার্জীর পরিণতির কথা সবই পড়া হয়ে গেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। পড়লাম ICMR-এর guidelineও। প্রবীণ চিকিৎসক অত্যন্ত রক্ষণশীল মানুষ। কোনোরকম পরীক্ষানিরীক্ষা ছাড়াই তিনি আমাকে বললেন—"I am telling you as your father, যাও বিয়ে করে এসো, তারপর করে দেব ART।" আমি ভাবলাম বিয়েই যদি করব, তাহলে আর আপনার কাছে আসব কেন। আমার সঙ্গে ছিলেন সে সময় সমাজ-মানসিক বিশেষজ্ঞ (social psychiatrist) মহোদয়, আমার donor হতে চেয়েছিলেন তিনি সেই সময়। কিন্তু হল না তখন। এইভাবে কলকাতার রক্ষণশীল চিকিৎসকরা একেকজন moral guardian-এর ভূমিকা পালন করলেন, আমার এক-শো ভাগ সৎ প্রচেষ্টায়, সততার উত্তরে।

ইতিমধ্যে রক্ষণশীলতার বজ্রআঁটুনিতে একদিন private hospital-এর এক গাইনোকোলজিস্টের পরামর্শ নিতে যাবার সময় কালীঘাটের ফুটপাথ থেকে plastic-এর শাঁখা-পলা লোহা পরে লাল টিপ পরে ওঁর সামনে টেবিলে হাত রেখে বসলাম। তবুও উনি ধরে ফেললেন, আমি দ্বিতীয়বার অবিবাহিত। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন— 'সত্যি কথা বলুন তো বিয়ে হয়েছে কি হয়নি।" আমি হাতের চুড়িগুলো দেখালাম। উনি বললেন—"তাতে কী হয়েছে, আজকাল ও সব কেউ পরে নাকি।" যদিও কাজটায় ওঁর সমর্থন ছিল। কিন্তু উনি ART বিশেষজ্ঞ বা তেমন বড়ো মাপের চিকিৎসক ছিলেন না। তাই ওই যাত্রায়ও হল না। Hospital-এর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি আবার শাঁখা-পলা, লোহা খুলে ফেললাম। এরপর আরও কিছুদিন কাটল। ইতিমধ্যে আলাপ এবং বন্ধুত্ব হল এক দীর্ঘকায়, দাড়িওয়ালা, উদারমনস্ক ডাক্তারের সঙ্গে। তিনি আমার কথা শুনে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত চিকিৎসকের সঙ্গে যিনি একই সঙ্গে স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ও ART বিশেষজ্ঞ। তাঁর কাছে একটা sitting হল। আমাকে পরীক্ষা করলেন, কিছু hormone test করতে লিখে দিলেন। আরম্ভ হল আমার উর্বরতা চিকিৎসা, আমার উর্বরতা যাত্রা—fertility treatment। তিনি যদিও জানতেন, আমি বিবাহবিচ্ছিন্না এবং পুনরায় বিবাহিত নই, তবুও আমি ওঁকে বললাম না, আমি পুনর্বিবাহিত নই এবং উনিও জিজ্ঞেস করলেন না আমার অবিবাহিত থাকার কথা। উনি না জানার ভান করলেন, আমি না বলার। সন্তান গ্রহণের ইচ্ছে এবং তদনুসারী পথ ধরে চলতে থাকল দিন, মাস, ক্ষণের হিসেব—menstruation (ঋতু) ovulation (ডিম্বাণু প্রস্ফুটন)। "ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত"। আমি পূর্ণ যৌবনবতী, বিবাহিত হই বা না হই আমি পরিপূর্ণ যৌবনের আগুনে, প্রবল ঋতুযন্ত্রণার তাড়নায়, ঋতুরক্তের রক্তিম দেহ-মনন বর্ণনে আমি মা হবই। কারণ আজ বসন্ত। ঋতু রক্ত রাঙিয়ে তোলে, রক্তাক্ত করে আমার মস্তিষ্ক, মন, মনন। আগুন জ্বেলে দেয় আমার মাতৃত্বের উদগ্র বাসনায়, বাসনার চরিতার্থতা চায়। আগুন পান করি যেন আমি। আমাকে প্রথমে তিনি সরাসরি প্রকৃতির নিয়মে মিথুনের পরামর্শ দেন কৃত্রিমতাহীনভাবে। তারপর ধাপে ধাপে এগোন একেক পদ্ধতিতে। প্রথমে AI (artificial insemination)—কৃত্রিমভাবে বীর্য প্রদান। আমার সঙ্গী ছিল "চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরসঙ্গী—প্রতিটা ART procedure-এ আমার donor। শুক্রাণুদাতা আমার ঈশ্বর+প্রকৃতি+পুরুষ।" না তিনি "আমার পুরুষ" নন, কিন্তু দুর্দিনের বন্ধু, যিনি অন্ধজনে আলো দেওয়ার মতো, মৃতজনে প্রাণ দেওয়ার মতো ক্ষুধিত নারীর মাতৃত্বের উদগ্র বাসনায় বিন্দু বিন্দু বীর্য দান করেছেন। আমার অঙ্গ ধন্য হয়, আমার অন্তর পূর্ণ হয়। কৃতজ্ঞতায় বলতে ইচ্ছে করে "এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।" "আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধহয়ে উঠলো ফুটি"। AI-তে হয় না, পরবর্তী পদক্ষেপ IUI–Intra-Uterine Insemination। IUI-তেও সাফল্য আসে না। পরবর্তী পদক্ষেপ laparoscopy করে fallopian tube দু-টি দেখে নেওয়া। পরীক্ষা হয়, report মেলে। পরবর্তী পদক্ষেপ IVF—In vitro fertilization। ইতিমধ্যে আমি ও আমার donor মুম্বই চলে যাই। সেখানকার এক ক্লিনিকে এক বিখ্যাত উর্বরতা বিশেষজ্ঞের কাছে আমি প্রথম IVF করাই। এই চিকিৎসক নিজে অবিবাহিতা, নিঃসন্তান, কিন্তু বহু test tube সন্তানের স্রষ্টা জননী। মুম্বইয়েই এই প্রখ্যাত চিকিৎসকের কাছে আমার

রাসায়নিক গর্ভসঞ্চার (chemical pregnancy) হয়। আমার beta HCG হরমোন হয় প্রায় এক-শোর ওপর। কিন্তু এই pregnancy বা গর্ভলক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। খুব কম দিনেই আরম্ভ হয় গর্ভপাত—বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ হতে থাকে যা ঋতুরক্ত নয়, গর্ভপাত। আমার মধ্যে রোপিত test tube-এ তৈরি হওয়া বহু যত্নের নিষিক্ত ভ্রূণ দু-টি থাকে না। অকালে তারা নিঃসৃত হয় বিন্দু বিন্দু রক্তধারায়। ২৪ দিন ধরে আমি ক্ষরিত হই, রক্তাক্ত হই। নিঃস্ব হই। নিঃশেষিত হই। সারারাত কাঁদি। তারপর operation theratre-এ নিয়ে গিয়ে আমার D&C বা D&E করা হয়। আবার ফোনে ওষুধের নির্দেশ আসে। কিন্তু prolactin বেশি, ওষুধটা হঠাৎ বন্ধ করতে বলেন মুম্বইয়ের চিকিৎসক। আমি রক্তাক্ত হতে থাকি আরও একটু। থামতে চায় না সে রক্তপাত।

তারপর আবার কলকাতার ART চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া, যিনি আমাকে দেখছিলেন। তিনি Trapic নামের একটা ওষুধ দিয়ে আমার রক্তক্ষরণ বন্ধ করেন। বিরক্ত হন এবং কাগজপত্র দেখে বলেন "prolactin test করা ছিল না। Prolactin hormone ছিল অত্যন্ত বেশি। Prolactin test না করে IVF করা একটা crime।" মুম্বইয়ের বিখ্যাত চিকিৎসক এই ভুল করলেন! আমার প্রথম গর্ভসঞ্চার থাকল না। আবার দ্বিতীয় বারের চেষ্টা। কলকাতার এই চিকিৎসকের ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। তাই বাধ্য হই অন্য চিকিৎসকের সন্ধান করতে। আমি মুম্বই গিয়ে অন্য চিকিৎসকের কাছে IVF করার কারণে ওঁর ভালো লাগেনি। তার প্রয়োজনও হয়তো ছিল না, কিন্তু আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম।

২০১০ সালের এই সময়টায় আমি গভীর trauma-এ আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। এমনি সময় এক বন্ধুর আত্মীয়তার সূত্রেই এক চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত আমি সফল হলাম এবং তিনি ও তাঁর টিমও আমার ওপর IVF করে সফল হলেন। কলকাতার মধ্যে হলেও তাঁর চেম্বার আমার বাড়ি থেকে অনেক অনেক দূরে। 'দূরে কোথায় দূরে দূরে . . .' 'তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার, পথ ভুলে যাই দূরপানে সেই চুপকথার। পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা . . . মনে মনে।' প্রথম দিন আলাপ হওয়ার পরেই ওঁকে আমার খুব ভালো লাগল। একটা খুব positive feeling হল আমার মধ্যে। ওর স্ত্রী embryologist, অধিকাংশ sonography উনিই করতেন। প্রথম দিন দিদিও আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করলেন। ধাপে ধাপে in vitro fertilization করার প্রস্তুতি চলল। প্রথমে কিছু টেস্ট, তারপর ovulatory cycle follow করে এগোনো। মুম্বইয়ে আবার বিপুল খরচ হয়েছিল, প্রচুর হরমোন আমাকে inject করা হয়েছিল অযথা, যা আসলে ফলপ্রসূ হল না। কোনো কাজে লাগেনি। অত high dose-এর hormone আমার স্ত্রী-প্রজননতন্ত্র নিতেই পারেনি। শরীর প্রত্যাখ্যান করেছিল বাইরে থেকে আসা element। কলকাতায় বেশি খরচ হয়নি, হরমোন dose ছিল খুবই কম। প্রসঙ্গত, বেশিমাত্রায় হরমোন বা হরমোনাল ড্রাগ গ্রহণ করলে মেয়েদের শরীরে ক্যানসারের সম্ভাবনা, বিশেষত স্তন ক্যানসার বা ওভারিয়ান ক্যানসারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই সম্ভাবনার কথা জেনেও ডাক্তারেরা এই চিকিৎসা করেন।

পরের বার IVF করা হলেও তাতে গর্ভসঞ্চার হয়নি অর্থাৎ pregnancy আসেনি। আমার মধ্যে রোপিত embryoগুলোর implantation বা রোপণ ঘটেনি। তারপর এক শূন্যতা। আমি নিজের জন্য কিছুটা সময় চেয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে। তিনি দিয়েছিলেন আমাকে একটা কয়েকমাস সময়ের বড়োসড়ো break, যদিও সেই break-এর সময় পরিকল্পনামতো ওষুধ চলেছে। ২০১১ সালের April-এর শেষ সপ্তাহে আমি London এবং Berlin-এ ছবির একক প্রদর্শনী করতে গেলাম, দু-মাসেরও বেশি সময়ের জন্য। আমি দেশে ফিরেছিলাম জুন মাসের শেষে। এই দীর্ঘ সময়টা আমাকে contraception বা জন্মনিয়ন্ত্রণ tablet বা birth control pill দিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে আমার মধ্যের ডিম্বাণু প্রস্ফুটিত হয়ে খরচ না হয়ে যায়। ওই ক-মাস ডিম জমিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছিল ওষুধ দিয়ে। কিন্তু London-এর exhibition-এর ব্যস্ততায় আমি কয়েকদিন Novelon এবং Ovidin D বা Ovisteron খেতে ভুলেই গেছিলাম। আমার পছন্দের ওষুধ যদিও Ovisteron। কিন্তু এই ওষুধগুলো contraceptive pills, নির্ধারিত সময়ের আগে বন্ধ করলেই ঋতুর মতো রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয় এবং চলতেই থাকে। তখন বিপরীতধর্মী ওষুধ খেয়ে তা কমাতে হয়। দেড়মাস ধরে ওষুধের ভুলে বিদেশে আমি ক্ষরিত হতে থাকলাম। আমার রক্তক্ষরণ অব্যাহতভাবে চলতেই থাকল। বিদেশে medical insurance থাকা সত্ত্বেও এবং আমার প্রদর্শনীটি হওয়া সত্ত্বেও দূতাবাসের মহিলা কর্মী জার্মানিতে আমাকে কোনো চিকিৎসকের সহায়তা দিতে পারেননি বা দেননি। আমি বুঝলাম এই medical insuranceগুলো আসলে বোধহয় কোনো কাজের না। আমার মাকে ভারতীয় ওষুধ পাঠাতে বললে তা কলকাতা থেকে Berlin পৌঁছোলো প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে এক মাস পরে আমার ভারতবর্ষে ফেরার বিমানের ঠিক আগের দিন। আমার ফেরত আনার ছবিগুলো DHL-এ কলকাতা ফেরার air shipment booking করে ফিরে এলাম Indian Embassy-র সামনে। Tear Garten-এ আমি আর Daniel গেলাম একটু বসতে। সেই সময় আমার mobile-এ সাংবাদিক কবি বন্ধু দাউদ হায়দার ফোন করে MF Hussain-এর মৃত্যু সংবাদ দিলেন। আমি কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ রইলাম। জুন মাসের শেষে আমি দেশে ফিরে এলাম একদিন রাতে লুফৎহানসার বিমানে business class-এ। তারপর একমাসের একটু বেশি সময় নিজের মতো নিয়েছিলাম মায়ের মানসিক অস্থিরতার কারণে। আগস্ট থেকে আবার hormone, ওষুধ injection IVF-এর পুরোদমে প্রস্তুতি, ovulation-এর লক্ষ্যে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমার দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমার ডিমগুলো যেন Russian cavier-এর মতো মহামূল্যবান। ২০১১-এর আগস্ট-এর শেষে আমার মধ্য থেকে অঙ্কুরোদ্গম-অভিমুখী পরিণত ডিমগুলি তুলে নেওয়া হল। Test tube-এ আমার কাঙ্ক্ষিত পুরুষের শুক্রাণুর সঙ্গে নিষিক্ত করা হল পরিপূর্ণ ডিম্বাণুগুলি। নিষিক্ত তিনটি (8 cells embryo) আটটি কোষে বিভাজিত ভ্রূণ আমার মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হল। Ovum pick up বা operation theatre-এ গিয়ে ডিম্বাণু উত্তোলন এবং ভ্রূণ প্রতিস্থাপনের সময় যতক্ষণ সংজ্ঞায় ছিলাম, আমার সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান। আমি খালি পড়তাম—

'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আরো কোলাহল নাই
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই।
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে, নিবিড় আঁধার ঘনাইলো বাহিরে—
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে জ্বলিতেছে এক ঠাঁই। . . .

অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হলো সমাধান।
চপল চঞ্চল লহরী লীলা পারাবারে অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয় মাঝে শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপকান্তি নিরখি অন্তরে মুদিত লোচনে চাই।'

এবারে আমি সফল হই, সেই সঙ্গে সফল হন আমার চিকিৎসকরা। পুরো IVF পদ্ধতিটাকে আমি পরের দিকে খুব relaxed, ধ্যানমগ্নভাবে নিয়েছিলাম। আমি ক্লিনিক-এ যাবার পথে, OT-তে ঢোকার আগে, পরে, গীতবিতান খুলে 'গভীর রজনী' পড়তাম। চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হয়ে ''প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে জ্বলিতেছে এক ঠাঁই'' অনুভব করতাম, নিজের মধ্যে, নিজের অন্তরাত্মায়। এইভাবে যেন আমার সব পাপের স্খালন হয়েছিল। যেসব প্রেমিক পুরুষদের আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম কৈশোরে, প্রথম যৌবনে, তাদের সবার কাছে এই গানটার মাধ্যমে যেন ক্ষমা চেয়েছিলাম। যেন confess করেছিলাম এক আত্মমগ্ন confession-এ। এ ছাড়া, আমার embryologist (আমার ডিমদিদি) এবং গায়নোকোলজিস্টের কথামতো আমি exercise এবং যোগাসন করতাম নিয়মিত। প্রাণায়াম করতাম গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। আমার কোলে তখন থাকত মুম্বইয়ের হাজিয়ালির এক খেলনার দোকান থেকে কেনা আমার donor প্রেমিকের দেওয়া উপহার একটি সদ্যোজাত বালক পুতুল- nappy clad বা wrapping towel পরা। ওর নামও তকাই। এইভাবে যখন সফল হইনি তখনকার agony -কেও আমি অতিক্রম করতে পেরেছিলাম। 'সকল বাসনা, চিত্তে এলো ফিরে . . . নিবিড় আঁধার . . . ঘনালো বাহিরে।'' আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে নিঃসীম গভীরতায় জ্বলত এবং জ্বলে একটি প্রদীপ— 'প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে জ্বলিতেছে এক ঠাঁই।' ওই একটি প্রদীপ পৃথিবীর যাবতীয় positive energy-র প্রতীক আমার ভেতরে। আমার সন্তান, অমৃতের সন্তান অমরাবতী।

২০১১-র শরৎকালে অঙ্কুরোদ্গম অভিমুখী একটি বীজ আমার মধ্যে রোপণ করলাম। তা রোপিত (implantation) হল গভীর প্রত্যয়ে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ২০১১ আমি সন্তানসম্ভবা। প্রথম সন্তানের হৃদস্পন্দন শোনা গেল, ভ্রূণকে দেখা গেল sonography করে। একটু একটু করে 'একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে ভর' করা অমরাবতী আমার বাড়তে থাকল। আমার গুপ্তপ্রেমের স্বাক্ষর, আমার নিভৃত অন্তরের প্রদীপ। এইভাবে শরৎকাল গিয়ে হেমন্ত, শীত এল।

গভীর শীতে মুম্বইয়ে প্রদর্শনী করতে গেলাম। কনকনে ঠান্ডায় ভোর পাঁচটায় Christmas-এর দিন মুম্বই যাওয়ার বিমানে উঠলাম, হু হু বাতাসে আমার লেবু রঙের ওড়না উড়ে যায়, আমার গর্ভে তকাই। মুম্বইয়ে তিন সপ্তাহ ছিলাম। শেষ তেরোদিন একদম একা। Salvation Army-র তিনতলার ঘরে থাকতাম, lift ছাড়া ওঠানামা করতাম। একফুটেরও কম নীচু দোতলা বাঙ্কবেডে নীচের বাঙ্কে শুতে হত আমাকে। ওপর থেকে অন্য কোনো মেমসাহেবের ঠ্যাং ঝুলত মুম্বই শহরে gallery-র পাশে আমার আর কোনো আশ্রয় ছিল না যে। জীবনে আশ্রয়ের মূল্য আমি গভীরভাবে বুঝেছি বারে বারে ভ্রমণে, পর্যটনে। একা, মধ্যবর্তী সময়ে গর্ভধারণের কিছু অসুস্থতা, কলকাতায় ফেরা। আমার মধ্যে বাড়ছে অমরাবতী (তকাই)। ফেব্রুয়ারি ২০১২-তে আবার ICCR-এ প্রদর্শনী, একক। Homage to

চিত্র ৩. ঈলীনা বণিক অঙ্কিত

Rabindranath-''Journey of An Artist in the Light of Tagore''-এর দ্বিতীয় অংশ। ২৩/২৪ সপ্তাহের গর্ভাবস্থা নিয়ে ICCR-এর gallery-তে বসে থাকতাম, বিমানে যাওয়া আসার সময় ডাক্তারের লেখা fit to fly certificate নিয়ে plane-এ চড়তাম। মুম্বই থেকে ফেরার সময় airport-এ পৌঁছে দিয়েছিল আমার class-এর বান্ধবী ঝুমকা, খুব যত্নে ওর গাড়িতে। ICCR-এ থাকতে থাকতে ২৪ সপ্তাহ কেটে গেল। ২৪/২৫ সপ্তাহের maternal screening-এ Down syndrome-এর result ভালো এল। আমি sonography করার সময় ডাক্তারকে বললাম—

''উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে মোর চিত্তমাঝে
চির নূতনের দিলো ডাক / (আমার সন্তানের জন্মদিন ২৭শে বৈশাখ)
ব্যক্ত হোক জীবনের জয় . . .

ব্যক্ত হোক 'আমা' মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।"

আর কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা, amniocentesis, ইত্যাদিতে যেতে রাজি হইনি আমি।

বসন্ত পেরিয়ে গ্রীষ্ম। কলকাতার গাছে গাছে লাল, vermillion, cadmium red, কৃষ্ণচূড়ার রঙের আগুন। প্রবল সুন্দর গ্রীষ্ম—mid summer 2012। আমি La Martinier for Girls-এ গেছিলাম, মে মাসের ৭ তারিখ, পূর্ণগর্ভা আমি তখন। উঠে দাঁড়িয়ে হিলারি ক্লিন্টনকে প্রশ্ন করেছিলাম ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে সমাজে মা ও শিশুদের social security-র প্রয়োজন আছে কি না। উনি উত্তর দিয়েছিলেন শিশুরা জাতির, দেশের ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ। মায়েদের সযত্নে শিশুদের লালন করে বড়ো করে তুলতে হয়। সুতরাং মা ও শিশুদের প্রয়োজনে অবশ্যই social security থাকা উচিত। সাংবাদিক বরখা দত্ত হিলারির সাক্ষাৎকার শেষ করলেন। La Martinier for Girls-এর প্রকাণ্ড compound-এ একটা বড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছ অজস্র লাল ফুলে ফুলে ভরেছিল। ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে সেদিন ওখানে গেছিলাম। পুলিশ আমাকে metal detector-এর মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করেনি। ওখানকার শিক্ষয়িত্রীদের সুন্দর ব্যবহার মুগ্ধ করেছিল আমাকে।

১০/৫/২০১২ 'এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিলো দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার . . .
কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে
কার জীবনে . . . কার জীবনে প্রভাত আজি ঘুচায় অন্ধকার . . .'

জন্ম নিল অথবা আমার ART ডাক্তার গর্ভ থেকে টেনে বার করলেন আমার সন্তান। সদ্য ঘুমভাঙা সে কাঁদতে থাকল, প্রথমে খুব মৃদু। আস্তে আস্তে জোরে জোরে কান্না। এইটুকু ছোট্ট ছোঁয়া। নার্সরা বলল মেয়ে, আমি বললাম অমরাবতী। ব্যক্ত হল আমার মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়। 'অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হলো সমাধান'। গোটা artificial reproductive technology যেন একটা খেলা। প্রকৃতির সঙ্গে খেলা। সীমার সঙ্গে অসীমের খেলা। সেই কঠিন সাধনার, অধ্যবসায়ের বিজ্ঞানে এক পদ্ধতির অবসান হয়ে অসীম মঙ্গলে এসে মিলল মাধুরী। আমার চিকিৎসকদের, তাঁর team-কে, embryologist (ডিমদিদি)-কে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং প্রকৃতিকে, অসীমকে, নিয়তিকে আমার এবং আমাদের সকলের সমবেত ধন্যবাদ।

এবার আমার ভূমিষ্ঠ সন্তানকে নিয়ে সুস্থ রেখে, লালনপালন করার, বড়ো করে তোলার কঠিন যাত্রা। অমরাবতী এখন আড়াই বছর। আমি কলকাতার প্রথম IVF single mother, অনেক সামাজিক বাস্তবতা আমার জানা ছিল না। একান্ত প্রয়োজনে, গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে কখনো ডাক্তারদের বা কোনো কোনো সত্যকে আড়াল করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। আমার জীবনযুদ্ধের পথে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ও প্রয়োগকারীদের সহায়তায় "আমার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে অসীমের চিরবিস্ময় অমরাবতী"।

IVF-এর সাফল্যের হার মাত্র ১৪%। আমি পরে embryologist ডিমদিদিকে sms করি- "I am one of the 14 in a 100"

কুমারী মেরী আমাকে দেখে গেয়ে ওঠেন রবীন্দ্রসংগীত

'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।'

লেখক পরিচিতি: ঈলীনা বণিক, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী।

প্রকাশিত হয়েছে

মূল্য : ৬০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : বুকমার্ক (কলেজ স্কোয়ারের নিকট)
শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল-বেলতলা, হাওড়া)

মেনোপজ

মেনোপজ অর্থাৎ বরাবরের জন্য ঋতুচক্র বন্ধ হওয়ার পর মহিলাদের স্বাস্থ্যে কী কী পরিবর্তন হয়, কোন কোন সমস্যা হতে পারে আর কী ই-বা সেগুলোর প্রতিকার। লিখছেন— **ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই।**

মাসিক ঋতুচক্র স্থায়ীভাবে বন্ধ অর্থাৎ Menopause-এর অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের প্রজননক্ষম বয়সের অন্তিম লগ্নে জননতন্ত্রে ডিম্বাণুর কর্মক্ষমতা লুপ্ত হয়ে স্বাভাবিক ঋতুচক্র বন্ধ থাকা। একটানা ৬ মাস কোনো মহিলার বয়সের এই সন্ধিক্ষণে ঋতুবন্ধ থাকলে সাধারণত মেনোপজ বলে ধরে নেওয়া হয়। ভারতীয় মহিলাদের মেনোপজের সাধারণ সময় ৪৪.৩ বর্ষ; আর গড় বয়স ৫১। ধূমপান, অপুষ্টির কারণে তাড়াতাড়ি মেনোপজ আসতে পারে। মেনোপজ জননতন্ত্রের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। এটি পর্যায়ক্রমিক। প্রথম পর্যায়ে ডিম্বাণুর কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এই সময়টাকে Perimenopause বলা হয়। তখন ঋতুস্রাব অনিয়মিত হতে পারে। Perimenopause শেষ স্রাবের অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে এক বছর পর পর্যন্ত থাকতে পারে।

মেনোপজ দু-প্রকারের -

(১) স্বাভাবিক (শারীরবৃত্তীয়)

(২) কৃত্রিম বা আরোপিত (সার্জিক্যাল)

কৃত্রিম মেনোপজ বিভিন্ন কারণে হয়, যথা কেমোথেরাপি, বিকিরণ দ্বারা চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, জননতন্ত্রে সংক্রমণ অথবা ডিম্বাশয়ে টিউমার (যখন ডিম্বাশয় বাদ দেওয়া হয়)। আমাদের আলোচনার পরিধি স্বাভাবিক মেনোপজ। এটি মহিলাদের বার্ধক্যজনিত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। মস্তিষ্কে অবস্থিত পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এফএসএইচ এবং এলএইচ হরমোন ক্ষরণ হয়ে ডিম্বাশয়কে প্রভাবিত করে। প্রভাবিত ডিম্বাশয় যুবতী মহিলাদের ঋতুচক্রের সময় ইস্ট্রাডিওল, টেসটোস্টেরন, প্রজেস্টেরন হরমোন চক্রাকারে নিঃসরণ করে। বয়সের সঙ্গে ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বাণু ও ডিম্বকোষের সংখ্যা অনেক কমে যায়। রক্তে ইসট্রোজেনের মাত্রা কমে যায়। ফলে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এফএসএইচ এবং এলএইচ হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। এই ডিম্বস্ফুটন (Ovulation) অনিয়মিত হয়। ডিম্বস্ফুটন ঠিকমতো না হওয়ার দরুন প্রজেস্টেরন তৈরি হয় না। ফলে মানবশরীরে তপ্ত অনুভূতি, অনিদ্রা, রুক্ষ মেজাজ ইত্যাদি Perimenopause-এর লক্ষণগুলি প্রকট হয়। বহুকাল পরে এরই প্রভাবে অস্টিওপোরোসিস এবং ভ্যাজাইনাল অ্যাট্রপি হতে পারে।

Postmenopause- ঋতুচক্র স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়ার পরে ইসট্রোজেনের মাত্রা খুব কমে যায়। ডিম্বস্ফুটন একদমই হয় না। প্রজেস্টেরন নিঃসরণ বন্ধ হয়। জরায়ুর অন্তর্স্তর পাতলা হয়ে ঋতুচক্র বন্ধ থাকে।

মেনোপজের লক্ষণসমূহ

- বুক ধড়ফড়
- তপ্ত অনুভূতি (Hot flush), প্রথম ১-২ বছর খুব বেশি হয়
- রাত্রে অতিরিক্ত ঘাম
- গায়ে জ্বালা ভাব
- অনিদ্রা

অন্যান্য লক্ষণও দেখা যায়

- যৌন অনীহা
- মাথা ধরা
- রুক্ষ মেজাজ, হতাশা, উদ্বিগ্নতা
- স্মৃতি দৌর্বল্য (অল্প ক্ষেত্রে)
- নিঃসাড়ে প্রস্রাব
- যোনি সংক্রমণ
- যোনিপথ সংকোচন ও যন্ত্রণাকর যৌনসংসর্গ
- গাঁটে ব্যথা

Osteoporosis: ঋতুবন্ধের পর শরীরে ইসট্রোজেনের মাত্রা কমের দরুন হাড়ের মধ্যে কোলাজেন ম্যাট্রিক্স-এ ক্ষয়জনিত পরিবর্তন, বিশেষত কশেরুকা (ভার্টিব্রা) ও রেডিয়াস (হাতের) নামক হাড়ের। এইসময় নরম হাড় ভেঙে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

চর্ম এবং নরম তন্তু সংক্রান্ত: স্তন শিথিল, সংকুচিত, ব্যথা ও ফোলাভাব। গোঁফের রেখা ওঠা ও মাথার চুল পড়া, চামড়াতে জ্বালা ও সুঁচ ফোটানো ঝিনঝিন অনুভূতি। মুখের চামড়া কোঁচকানো।

প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা

(ক) খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন

- অ্যালকোহল এবং মশলাদার খাবার বর্জন
- সয় (SOY) জাতীয় খাদ্য গ্রহণ; এতে ইসট্রোজেন থাকে
- প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম এবং ভিটামিন ডি সম্বলিত খাদ্য গ্রহণ
- শারীরিক ব্যায়াম এবং বিনোদন
  ধীর ও গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস আদান-প্রদান, মিনিটে ৬ বার অন্তত
  পেলভিক মাংসপেশির শক্তিবর্ধক ব্যায়াম
  টেনশন দূর করার জন্য যোগ, তাই চি, ধ্যান ইত্যাদি
  যৌন প্রক্রিয়া বজায় রাখা

(খ) হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা (HRT)

- হরমোন জাতীয় ওষুধ সেবন
- হরমোন নিষিক্ত জেল ব্যবহার
  বাহু, কাঁধ অথবা উরুতে প্রতিদিন এই জেল লাগাতে হবে
  Skin Patches- পিঠের পিছনে লাগাতে হয়
- হরমোন Pessaries এবং ভ্যাজাইনাল রিং ব্যবহার ক্ষেত্রবিশেষে
  হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা একটানা ৫ বছরের বেশি করা হয় না।

যে মহিলাদের বহুবছর আগে ঋতুবন্ধ হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই থেরাপি

নিষেধ। বিশেষ প্রয়োজনে সেইসব ক্ষেত্রে হরমোন নিষিক্ত ভ্যাজাইনাল ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। হরমোন থেরাপি লিভারের অসুখ, হার্টের অসুখ, রক্ত জমাটের ঘটনা (DVT, PE) বা যৌনাঙ্গের এবং স্তন ক্যানসারের ঘটনা থাকলে করা যাবে না। (HRT নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, পরে কখনো তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে)।

(গ) আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ব্যবস্থা

- অবসাদ দূরীকরণের ওষুধ (Paroxetine, Fluoxetine, Bupropion)
- গাবাপেনটিন জাতীয় ওষুধ

এই ওষুধগুলি তপ্ত অনুভূতি, রুক্ষ মেজাজ, উদ্বিগ্নতা, বিরক্তিভাব দূর করতে সাহায্য করে।

অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধের উপায়—যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালশিয়াম এবং ভিটামিন ডি গ্রহণ করা। অধুনা Bisphosphonates জাতীয় ওষুধ যথা alendronate, risedonate এবং calcitonin, parthormone ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে অনেক মহিলাদের ক্ষেত্রে Phytoestrogens ব্যবহার করা হয়। এটি স্টেরয়েড নয়; ভেষজ অনেক উদ্ভিদে Phytoestrogens থাকে যেমন, black cohosh, dong quai, ginseng, licorice. এদের মধ্যে বিভিন্ন ফেনোলিক যৌগ, যথা, isoflavones, lignans, mycotoxins পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে Phytoestrogens থাকে:

শস্য দানা: ওটস্, বার্লি, রাই, ব্রাউন রাইস, গম

বীজ: সূর্যমুখী, সীসাম, কুমড়ো, পোস্ত, তিসি

ডাল: সয়াবিন। এতে প্রচুর পরিমাণে থাকে।

বিন এবং লেগিউম: শিম, কড়াইশুঁটি, সবুজ বিন।

সবজি: পেঁয়াজ, রসুন, ব্রকোলি, টম্যাটো

অতএব, যে মহিলারা বয়সের এই সন্ধিক্ষণে পৌঁছোবেন বা পৌঁছেছেন তাঁদের অযথা চিন্তার কোনো কারণ নেই; এটাই জননতন্ত্রের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। এটা বরং না হওয়াটা অস্বাভাবিক।

লেখক পরিচিতি: ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রশাসক ছিলেন। বর্তমানে জেরিয়াট্রিক মেডিসিন নিয়ে কর্মরত।

প্রকাশিত হয়েছে

প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সংগ্রহযোগ্য একটি ম্যানুয়াল

প্রাথমিক চিকিৎসা, বিষক্রিয়া ও আহতের যত্ন

পুণ্যব্রত গুণ

দাম ১০০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ চেঙ্গাইল।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ),

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন নিয়ে দু-চার কথা

'সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য' পেতে গেলে সকলের, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের, সরকারি ব্যবস্থায় সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে— *লিখছেন* **ডা. অভিজিৎ পাল।**

'Health for all'—সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য। কথাটা ভীষণ প্রচলিত, শুনতেও ভালো লাগে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এটা খুব অলীক স্বপ্নই রয়ে গেল। বিজ্ঞানের বিশাল অগ্রগতির সঙ্গে কেন মানানসই হতে পারেনি আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা? ভাবতে হবে, আলোচনা করতে হবে, যারা জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছে জানতে হবে, কী এর ব্যখ্যা।

দৈনন্দিন জীবনের আর পাঁচটা সমস্যার মতোই স্বাস্থ্যহীনতার সমস্যাও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা গভীরভাবে শ্রেণি বিভক্ত। তাছাড়া রয়েছে জাতপাত ও ধর্মের বিভেদ। যারা সমাজকে পরিচালনা করছে, তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রেখেছে বলেই প্রভুত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ দেশের কোনো প্রকল্পই প্রকৃত রূপে 'জনগণের' প্রকল্প হতে পারছে না। তাই স্বাস্থ্য আমাদের কাছে 'জন-স্বাস্থ্য' হতে পারছে না। সমাজের ওপরের দিকের মানুষ যারা, তারাই সুস্বাস্থ্যের বন্দোবস্ত করতে পারছে। কারণ, তারা স্বাস্থ্য কিনে নিতে পারছে। বেশ কিছু মানুষ আছে, যারা সাধ্যের বাইরে গিয়ে ধার দেনা করে চিকিৎসা করাচ্ছে ও অবশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। আর সমাজের ৭৫% মানুষ এই চিকিৎসার নাগালই পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে বিনা চিকিৎসায় ভুগতে ভুগতে তারা মৃত্যুর কোলে অকালেই ঢলে পড়ছে। যেকোনো রাজনৈতিক দল যখন সরকারে আসছে, তারা বলছে যে সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় সকলের কাছে বিনা পয়সায় আধুনিক চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া। আমার প্রশ্ন হল, তা হলে যে মানুষটা দামি চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে পারবে না, সে কি চিকিৎসা পাবে না? এটা কি তার অধিকার নয়? ভোট দেওয়া যদি তার অধিকারের মধ্যে পড়ে ও জীবনের পবিত্র কর্তব্য হয়, তা হলে এটাই বা তার অধিকার নয় কেন?

সকলের জন্য স্বাস্থ্যই জনস্বাস্থ্য

আমাদের বুঝতে হবে যে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের অধিকার। 'সকল' বলতে আমরা সমাজের এই ৭৫% মানুষকে বোঝাই। বাকি ২৫% জনকে নিয়ে আমাদের অতটা ভাবতে হবে না। কারণ, সরকার এদের জন্য 'প্রাইভেট হেলথ সিস্টেম' গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আর এই সিস্টেমে এরা পয়সা খরচ করে উন্নতমানের চিকিৎসা ক্রয় করে নিতে পারে। তা ছাড়া, এরা বিভিন্ন হেলথ ইনস্যুরেন্সের মারফত বড়ো বড়ো হাসপাতালে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। আজকাল আবার সরকারি চাকরিজীবীরা একটা ইনস্যুরেন্সের সুযোগ পাচ্ছেন, যার ফলে তারা বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে চিকিৎসা করাতে পারেন। সরকার এদের ব্যয়ভার বহন করে। এ তো গেল ২৫%-এর ব্যবস্থা। বাকি ৭৫%-এর কী ব্যবস্থা আছে? এই বিশাল সংখ্যার মানুষের জন্য যা আছে তা অপ্রতুল ও অনেক ক্ষেত্রেই খুব নিম্ন মানের। আজ আর কারও কাছে গোপন নেই যে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কী হাল ও কেন গরিব মানুষ একান্ত নিরুপায় না হলে সেখানে যেতে চায় না। আসলে দেশের শাসকদের কাছে এই ৭৫% মানুষের জীবনের কোনো দাম নেই। শুধু এদের ভোটের দাম আছে। তাই জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রধান দাবি সব সময় সরকারি হেলথ সেন্টার থেকে সব স্তরের সরকারি হাসপাতালগুলিতে যেন উন্নত মানের চিকিৎসার বন্দোবস্ত থাকে ও দেশের মানুষ যেন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয়। এই ব্যবস্থার কাঠামো আমাদের দেশে আছে কিন্তু চাহিদা মেটানোর জন্য অপ্রতুল ও চিকিৎসার মান অনেক ক্ষেত্রেই আশানুরূপ নয়। আসলে সংখ্যায় অনেক কম হওয়ার জন্য প্রচণ্ড ভিড় হয় প্রত্যেকটা সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে। যার ফলে যথেষ্ট সময় ও যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করে ওঠা হয় না।

সরকারি হাসপাতালের অবস্থা

হাসপাতাল হল মন্দির / মসজিদ / চার্চ। এখানকার পরিবেশ হওয়া উচিত শান্ত, স্বাস্থ্যকর, মনোরম। কিন্তু আমরা এর উলটোটাই দেখতে পাই। ছোটোবেলা থেকেই আমরা দেখছি যে সরকারি হাসপাতাল নোংরা, ভিড়ে ঠাসা, চেঁচামেচি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভরপুর। তাই আমাদের বিশ্বাস চলে গেছে এদের ওপর থেকে। যে সরকারই থাকুক না কেন তাদের কাছে আমাদের দাবি 'স্বাস্থ্যকর' সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা। এর জন্য চাই স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দের অংশ অনেকটাই বাড়ানো। তার সঙ্গে ব্যাপক অপচয় ও চুরি বন্ধ করা।

সরকার বলছে একার পক্ষে এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে সুস্বাস্থ্য দেওয়া সম্ভব নয়। এটা কিন্তু সত্যি নয়। সরকারি হাজার হাজার কোটি টাকা অনেক বাজে ভাবে খরচা হয়ে যায়। এর হিসাব আমরা জানতে পারি না। আবার সমস্যার সমাধানে সরকার পি.পি.পি. মডেল আনছে। কতকগুলো ক্ষেত্রে এনেও ফেলেছে। এটা কী? এটা হল পাবলিক্ প্রাইভেট পার্টনারশিপ। অর্থাৎ সরকারি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি মালিক বা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে পরিষেবা দেবে। তার জন্য তারা রোগীর কাছ থেকে টাকাও নেবে। এটা কিন্তু একটা সরকারি ভাঁওতা। কারণ এটাও বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। উদাহরণস্বরূপ — হাসপাতালে সি.টি. স্ক্যান এই প্রকল্পে আছে এবং খরচ নেহাৎ মামুলি নয়। যারা সরকারি হাসপাতালে যায়, তাদের বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব হয় না। সরকার এই ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করছে জেলার হাসপাতালগুলোতেও। তাই বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবিই হলো প্রধান দাবি। অনেকে মনে করেন যে এই দাবি অবাস্তব। আমাদের বিশ্বাস যে এই দাবি পুরণ করা যেতে পারে, কারণ, পৃথিবীর বহু দেশেই এই ব্যবস্থা চালু আছে। আর সেই সব ক-টা দেশই যে সমাজতান্ত্রিক দেশ, তাও নয়। সুতরাং আমাদের দেশ ধনতান্ত্রিক দেশ হলেও এখানেও আমরা চাইব বিনামূল্যে চিকিৎসা সরকারি তত্ত্বাবধানে। সাম্যবাদী চিন্তা নিয়ে সমাজতন্ত্রের লড়াই ও শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের লড়াই তো চলবেই। তার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য আন্দোলন ও জনশিক্ষা আন্দোলনও জোরদার করতে হবে। সামনে লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যেতে হবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. অভিজিৎ পাল, এমবিবিএস, এমডি, ডিটিএম অ্যান্ড এইচ, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।